যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিভ্রান্তি ও চক্রান্ত

শাহরিয়ার কবির

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১১

স্বত্ব ❑ অর্পণ শাহরিয়ার
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি ❑ আবীর আবদুল্লাহ
পরিকল্পনা ❑ লেখক

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ❑ পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

দাম ❑ একশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984 70105 0433 0

Trial of War Criminals : Confusion and conspiracy
(a collection of articles) by Shahriar Kabir.
Published by : Monirul Hoque, Ananya 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : February 2011, Price : 150.00 Take Only.

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**
22, Brick Lane, London

U.S.A Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372

Canada Distributor ❑ **Anyamela**
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202

Canada Distributor ❑ **ATN Mega Store**
2970 Danforth Ave. Toronto

উৎসর্গ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল ঢাকা সহায়ক মঞ্চের
সহযোদ্ধাদের

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের বিচারের সিদ্ধান্ত প্রথম গ্রহণ করেছিল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী মুজিবনগর সরকার। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে এই সরকারের কেবিনেট সচিব এইচ টি ইমাম স্বাধীন বাংলাদেশের সকল জেলা প্রশাসক এবং মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়কদের '৭১-এর গণহত্যা ও নির্যাতন সহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের জন্য জরুরি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার ১৯৭১-এর ১৩ ডিসেম্বর, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের ৩ দিন আগে মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সহযোগীদের বিচারের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। ১ জানুয়ারি ১৯৭২-এ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠকে 'গণহত্যা তদন্ত কমিশন' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বদেশে ফিরে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর প্রথম জনসভায় বলেন, 'বিশ্বকে মানবেতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। ...যারা দালালী করেছে, আমার শত শত দেশবাসীকে হত্যা করেছে, মা বোনকে বেইজ্জতি করেছে তাদের কি করে ক্ষমা করা যায়? তাদের কোন অবস্থায় ক্ষমা করা হবে না। বিচার করে তাদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে।' (দৈনিক বাংলা, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)

এরপর বঙ্গবন্ধুর সরকার '৭১-এর ঘাতক দালালদের বিচারের জন্য ২৪ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ কলাবরেটর্স (স্পেশাল ট্রাইবুনালস) অর্ডার ১৯৭২' প্রণয়ন করে, যাতে পরবর্তী ৬ মাসে তিনটি সংশোধনী করা হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জনসভায় এবং সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার বার বার ব্যক্ত করেছেন।

৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দশ লক্ষ লোকের বৃহত্তম জন সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, যারা গণহত্যা চালিয়েছে তারা সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, এদের ক্ষমা করলে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না।' (দৈনিক বাংলা, ৭/২/৭২)

৩১ মার্চ খুলনার জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'বর্বর হানাদার বাহিনীর সাথে স্থানীয় সহযোগী রাজাকার, আলবদর, জামাত প্রভৃতি যোগ দেয়। তারা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যদি কেউ দালালদের জন্য সুপারিশ করতে আসে তবে

তাকেই দালাল সাব্যস্ত করা হবে, দালালদের কখনোই ক্ষমা করে দেয়া হবে না।' (পূর্বদেশ, ১/৪/৭২)
২৬ এপ্রিল তিনি দিল্লী স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যারা গণহত্যা করেছে তাদের এর পরিণতি থেকে রেহাই দেয়া যায় না। এরা আমার ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করেছে। এদের ক্ষমা করলে ভবিষ্যত বংশধরগণ এবং বিশ্ব সমাজ আমাদের ক্ষমা করবে না।' (দৈনিক বাংলা, ৩০/৪/৭২)/
৬ মে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (এবিসি) সাথে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদের বিচার করব, এ ব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। যেখানে তারা ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করেছে সেখানে কোন দেশ কি তাদের ছেড়ে দিতে পারে?' এই সাক্ষাৎকারেই দালালদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দালালদের কেসগুলো একটি তদন্ত কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হবে। আমরা তদন্ত করছি এবং নির্দোষ লোকদের ছেড়ে দিচ্ছি, অবশ্য যারা অপরাধ সংগঠনের জন্য দায়ী নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।' (আজাদ, ১৫/৫/৭২)
দালাল আইনে বিচারের জন্য কয়েক দফায় ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়, যাদের ভেতর প্রায় ২৬ হাজার ১৯৭৩-এর মে মাসে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার সুযোগ লাভ করে জেল থেকে মুক্তি পান। ১১ হাজারের বেশি অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য না হওয়ায় তাদের বিচার প্রক্রিয়া বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৭ মে ১৯৭৩-এ জারিকৃত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেসনোটে বলা হয়েছে—
গতকাল ১৬ মে— বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশ কয়েক শ্রেণীর অভিযুক্ত এবং সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তি ও কয়েক শ্রেণীর অপরাধের ক্ষেত্রে এই ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ১৮ ধরনের এক বা একাধিক বা সকল অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শিত হবে না। উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দখলদার সেনাবাহিনীর স্বপক্ষে দেশের ভিতরে বা বাহিরে প্রচারণায় অংশগ্রহণ, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকার বা সরকারের মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পদ গ্রহণের জন্য দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত এবং আল বদর বা আল শামস-এর সদস্য ও রাজাকার কমান্ডার হওয়ার কারণে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও অনুকম্পা প্রদর্শনের আওতায় পড়িবে না। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়, 'সরকার ঘোষিত অনুকম্পা লাভে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তিকেই জেল হাজতে থাকিলে এই ঘোষণা

প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের লিস্ট হাজির করিতে হইবে। অনুকম্পা লাভে ইচ্ছুক সকলকেই সংশ্লিষ্ট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত মুচলেকা দিতে হইবে এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকারের ঘোষণা দিতে হইবে।' (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর যাচাই-বাছাই ও মুক্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ৬ মাসেরও বেশি সময় লেগেছিল। ৩০ নবেম্বর ১৯৭৩ সালে সাধারণ ক্ষমার আওতাধীন ব্যক্তিরা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৭৩-এর সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য ছিল দালাল আইনে আটক বাঙালি অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ১৯৫ জন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ সরকার বিচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সেই সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের দায়ে পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তাদের বিচার বন্ধের ক্ষেত্রে দ্বৈতনীতি গ্রহণ করেছিলেন— ১. বাংলাদেশ সরকারকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করা। ২. বাংলাদেশ সরকার ক্ষমাপ্রদর্শনে সম্মত না হলে পাকিস্তানে আটক দুই লক্ষেরও অধিক বাঙালি সামরিক-বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের ফেরত না পাঠানো। ঢাকায় তখন পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালিদের পরিবারের সদস্যরা প্রায় প্রতিদিন সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান ধর্মঘট প্রভৃতির দ্বারা সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিলেন যে কোন মূল্যে তাদের স্বজনদের দেশে ফেরত আনার জন্য। এ ছাড়া ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে বিচার না করার জন্য বাইরের চাপও ছিল। যার ফলে ১৯৭৪-এর ২২ এপ্রিল দিল্লীতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের ক্ষমাপ্রার্থনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ১৯৫ জন পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তাকে ক্ষমাপ্রদর্শন করে। এই চুক্তি অবশ্য বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কখনও উত্থাপিত হয়নি এবং এর কোন আইনি ভিত্তি নেই। বাংলাদেশ চাইলে যে কোন সময়ে এদেরও বিচার করতে পারে।

'৭১-এর ঘাতক, দালাল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গত ১৯ বছর ধরে আন্দোলন করছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পেশাজীবী-মুক্তিযোদ্ধা-ছাত্র-যুব-নারী সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে বেগবান করেছে। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোটের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। মহাজোটের অভূতপূর্ব বিজয় ছিল এই বিচারের প্রতি বিপুল সংখ্যক তরুণ নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি নস্যাৎ করার জন্য জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগীরা গত ১৯ বছর ধরে নির্মূল কমিটির আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করছে,

মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক কথা বলছে, দাবি করছে— '৭১-এ যুদ্ধাপরাধের কোন ঘটনা ঘটেনি, জামায়াতের ভেতর কোন যুদ্ধাপরাধী নেই, বঙ্গবন্ধু সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ইত্যাদি। আমরা গত ১৯ বছর ধরে জামায়াতের যাবতীয় মিথ্যাচারের জবাব দিচ্ছি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এবং এ সম্পর্ক বিভ্রান্তি দূর করার জন্য।
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ধরন, পদ্ধতি ও '৭৩-এর আইন সম্পর্কে বিভ্রান্তি আমাদের মিত্রদের ভেতরও রয়েছে। বিশেষভাবে ক্ষমতায় আসার পর মহাজোট সরকারের মন্ত্রীদের অজ্ঞতাপ্রসূত বহু উক্তি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভেতর বহু বিভ্রান্তি, ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি করেছে।
২০১০ সালের ২৫ মার্চ সরকার '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল' গঠন করেছে। এই ট্রাইবুনাল গঠনের আগে থেকেই জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা বিচার বানচাল করার জন্য দেশে ও বিদেশে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে। তারা কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ব্যক্তিকে ভাড়াও করেছে এ নিয়ে দেন-দরবার করার জন্য। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে '৭৩-এর আইন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর সরকারের সাধারণ ক্ষমা, এত বছর পর বিচারের যৌক্তিকতা, ট্রাইবুনালের কার্যবিধি প্রভৃতি বিষয়েও তারা মিথ্যা ও বিভ্রান্তমূলক প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। তাদের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরকার শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে বিদেশে আমাদের অনেক বন্ধুও এই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন।
দেশে ও বিদেশে প্রচারিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত বিভ্রান্তি ও চক্রান্তের জবাব দেয়ার জন্য গত এক বছরে যা লিখেছি তার কয়েকটি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বিচার সংক্রান্ত কিছু আইনের ব্যাখ্যার জন্য প্রায়শঃ নির্মূল কমিটির সভাপতি বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ ও এ্যাটর্নি জেনারেল এডভোকেট মাহবুবে আলমের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। এই সুযোগে তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।
আশা করি এই গ্রন্থ আমাদের আন্দোলনের তরুণ নেতা, কর্মী, সমর্থক এবং সরকারের নীতি নির্ধারকদেরও ভ্রান্তি নিরসনে সহায়ক হবে।

শা. ক.
বইমেলা ২০১১

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঃ বিভ্রান্তি ও চক্রান্ত

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। শুধু দেশে নয় প্রবাসেও এই বিচারের পক্ষে-বিপক্ষে বাংলাদেশী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অত্যন্ত আগ্রহী। '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তাদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে ১৯ বছর আগে শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যে অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তখন থেকে এই বিচারের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে দুই পক্ষের ভেতর বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রধান বিভ্রান্তির জনক '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীরা, তাদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী এবং জামায়াতের প্রধান মিত্র বিএনপি। এরা বিচার বানচালের জন্য উদ্দেশ্যমূলক ও পরিকল্পিতভাবে লাগাতার মিথ্যা ও বিভ্রান্তমূলক কথা বলছে। নিঃসন্দেহে তাদের এসব আচরণ ও কর্মকাণ্ড যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিঘ্নিতকরণের চক্রান্তের অন্তর্গত। জামায়াত এবং তাদের সহযোগীদের জন্য এটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় ধরনের বিভ্রান্তি আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের মিত্রদের ভেতর। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কোন আইনে কোথায় কীভাবে হবে এসব বিভ্রান্তির সিংহভাগ আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা, লেখালেখি ও মতবিনিময়ের দ্বারা অপসারিত হলেও বিচারের পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে বর্তমান মহাজোট সরকারের নীতি নির্ধারকদের ধারণা এখনও যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। অথচ এই সরকারের আমলে শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং শাস্তি নিশ্চিত না হলে ভবিষ্যতে কখনও তা হবে এমন ধারণা অতি আশাবাদী মানুষও পোষণ করেন না।

'৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহজোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে দু বছর আগে। আওয়ামী লীগ সহ মহাজোট সরকারের শরিক সকল দলের নির্বাচনী ইশতেহারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি ছিল। জেনারেল এরশাদের 'জাতীয় পার্টি' এবং মওলানা মিসবাহুর রহমানের 'ইসলামী ঐক্যজোট' ছাড়া মহাজোটের শরিক অন্য সব দল '৭১-এর ঘাতক দালালবিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকেই ছিল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে তখনও শরিকদের ভেতর কিছু বিভ্রান্তি আমরা লক্ষ্য করেছি। ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' যখন গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের কর্মসূচী ঘোষণা করে— রাজনৈতিক দলের কেউ কেউ আমাদের নিরুৎসাহিত করার জন্য বলেছিলেন, ২৬ মার্চ (১৯৯২) রোজার মাসে এই উচ্চাভিলাষী কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। এদের কেউ দাবি করেছিলেন— পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমের বিচার নয়, তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। আমাদের মিত্রদের এসব বক্তব্য তখনকার বিভিন্ন দৈনিকেও ছাপা হয়েছিল।

২৬ মার্চ (১৯৯২) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমরা গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলাম তা নিয়ে সরকারি মহলেও প্রশ্ন, বিভ্রান্তি ও হুমকি কম ছিল না। খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারের অবস্থান ছিল— এই কর্মসূচী প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা ও চ্যালেঞ্জ, এসব বরদাশত করা হবে না। তারা মনে করেছেন সদ্য নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে বিব্রত করার জন্য আওয়ামী লীগ এসব করাচ্ছে। আমরা পরিষ্কার বলেছি— গণআদালত একটি প্রতীকী বিচার, এটি বিদ্যমান বিচারব্যবস্থার প্রতি কোন অনাস্থা বা চ্যালেঞ্জ নয়। আমরা গণআদালতের এই ধারণা পেয়েছি ১৯৬৭ সালে ভিয়েতনামের যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য প্যারিসে গঠিত ভিয়েতনাম ট্রাইবুনাল বা প্যারিস ট্রাইবুনাল থেকে, যার উদ্যোক্তা ছিলেন দুই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও লেখক ফ্রান্সের জাঁ পল সার্ত্র ও ইংল্যান্ডের বার্টার্ন্ড রাসেল। এই ট্রাইবুনালের বিচারিক কার্যক্রমে বিভিন্ন দেশের বরেণ্য আইনজ্ঞ ও মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভিয়েতনামে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল প্যারিস ট্রাইবুনাল।

এতসব বলার পরও সরকারের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি, কারণ ১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনেই বিএনপি সরকার গঠন করেছিল। বিএনপির জন্য আমাদের কর্মসূচী ছিল অত্যন্ত বিব্রতকর ও আপত্তিকর। গণআদালত বানচালের জন্য তারা সবরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল এবং গণআদালতের সাফল্যে ক্ষিপ্ত হয়ে এর উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাও দায়ের করেছিল। বিএনপির চাপে অথবা তাদের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে আমাদের মিত্রদের কেউ কেউ বলেছিলেন ২৬ মার্চ গণআদালত না করে গণসমাবেশ করতে। এসব বিভ্রান্তি ও বাধা তখন আমরা কীভাবে মোকাবেলা করেছিলাম তার বিবরণ রয়েছে আমার 'গণআদালতের পটভূমি' ও 'জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি' গ্রন্থে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কোথায় কীভাবে হবে এ নিয়ে আমাদের বন্ধুমহলে বিভ্রান্তি তখনও ছিল, এখনও আছে। আমরা যখন ১৯৭৩-এর 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন' অনুযায়ী বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে বিচারের দাবি তুলেছি অনেকে বলেছেন— এমনকি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও বলেছিলেন আমাদের কাছে গোলাম আযমের যুদ্ধাপরাধের তথ্যপ্রমাণ থাকলে আমরা কেন প্রচলিত আদালতে যাচ্ছি না। তাঁকে বলেছিলাম এবং আমাদের বন্ধুদেরও বলেছি— প্রচলিত ফৌজদারি আইনে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের কোন সংজ্ঞা নেই। প্রচলিত আইনে বিচার সম্ভব নয় বলেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে এসব অপরাধের জন্য এই অনন্যসাধারণ আইন প্রণয়ন করেছিলেন। এই আইনে বিচার না করলে ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পাবেন না। তারপরও তখন 'আজকের কাগজ'-এর সংক্ষুব্ধ সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদ তাঁর মুক্তিযোদ্ধা ভাইকে হত্যার জন্য যশোরের একটি আদালতে গোলাম আযম ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। এরকম শতাধিক মামলা ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও

হয়েছে, যখন এর নীতিনির্ধারকরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা সরকারিভাবে বলেছেন। ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ প্রথম সরকারপ্রধান যিনি বলেছিলেন— তাদের সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে, তবে তারা ট্রাইবুনাল গঠন করে বাদী হয়ে বিচারের উদ্যোগ নেবেন না, প্রচলিত আদালতে কেউ '৭১-এর হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন প্রভৃতির বিচার চাইলে সরকার তাদের সমর্থন দেবে। এর ফলে দীর্ঘকাল বিচারবঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগী যেমন বিভিন্ন আদালতে প্রিয়জন হত্যার বিচার চেয়ে মামলা দায়ের করেছেন অনেক জায়গায় জামায়াতের লোকজনও তাদের দলের অপরাধীদের বাঁচাবার কৌশল হিসেবে ফৌজদারি আদালতের আশ্রয় নিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। দেশের যে কোন আদালত একবার যদি বলে দেয় 'ক', 'খ' বা 'গ'-এর বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন বা লুণ্ঠনের অভিযোগ প্রমাণসিদ্ধ নয় তাহলে সে সব ব্যক্তিকে বিশেষ ট্রাইবুনালে আর বিচার করা সম্ভব হবে না, কারণ একই অপরাধে একজন ব্যক্তির দুবার বিচার হতে পারে না।

২০১০-এর ২৫ মার্চ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠনের আগে এবং পরে যেসব মামলা হয়েছে এক সময়ে মহাজোটের নেতারাও এসব উৎসাহিত করেছেন। আমাদের প্রবল আপত্তির কারণে সরকার দেশের বিভিন্ন আদালতে দায়ের করা যুদ্ধাপরাধের সকল মামলা ট্রাইবুনালে পাঠানোর নির্দেশ দিলেও এসব মামলা কীভাবে পরিচালিত হবে এ বিষয়ে ট্রাইবুনালের আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তারাও বিভ্রান্ত। গত ৪-৫ বছরে প্রকৃত ভুক্তভোগীরা বিচারের আশায় মরিয়া হয়ে প্রচলিত আদালতে মামলা করেছেন। সরকারের মন্ত্রী ও নীতি নির্ধারকরা যখন বলেন তারা অল্প কয়েকজনের বিচার করবেন এবং সেটা হবে প্রতীকী বিচার— তখন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বজনহারা ভুক্তভোগীরা ক্ষুব্ধ ও হতাশ হন। তারা আমাদের প্রশ্ন করেন— শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনের বিচারের ভেতর যদি ট্রাইবুনালের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তাদের কী হবে? অনেকে প্রশ্ন করেন এই ট্রাইবুনালে কি পাকিস্তানিদের যুদ্ধাপরাধের বিচার হবে না? জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা যখন বলে প্রধান যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানিদের ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়ে অন্যদের বিচার করার এখতিয়ার এই সরকারের নেই তখন এর জবাব আমরা দিতে পারি। কিন্তু সরকারের কোন মন্ত্রী যখন বলেন এই ট্রাইবুনালে শুধু বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদেরই বিচার হবে তখন বুঝতে হবে '৭৩-এর আইন এবং বিচারের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাদের ধারণা কতটা ভ্রান্ত।

২০০৭-এর ১১ জানুয়ারি ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর যখন থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়েছে সর্বস্তরের মানুষের ভেতর আবার '৯২-এর মতো জাগরণ আমরা লক্ষ্য করেছি। নির্মূল কমিটির যে সব সহযোগী ও ব্যক্তি '৯৬-এর পর থেকে নানাবিধ কারণে নিষ্ক্রিয় ছিলেন তারাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। কেউ বললেন জাতিসংঘে যেতে হবে, যুগোশ্লাভিয়া, রুয়ান্ডা, কম্বোডিয়ার মতো হাইব্রিড কোর্ট করতে হবে। কেউ বললেন, 'ট্রানজিশনাল জাস্টিস'-এর কথা, কেউ বললেন 'ট্রুথ এ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন' গঠনের কথা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা জাতিসংঘে গিয়ে মহাসচিবকেও বলে এলেন— যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলাদেশে গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গঠিত 'সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম'-এর নেতারা ২০০৭-এর অক্টোবরে সংবাদ সম্মেলনে বললেন, সরকার বিচার না করলে তারা বাদী হয়ে আদালতে যাবেন। এ নিয়ে দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীদের সমন্বয়ে একটি প্যানেলও তারা ঘোষণা করেছিলেন। 'সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম' তাদের সংবাদ সম্মেলনে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপন করে একটি তদন্ত কমিশন গঠন এবং 'কতিপয় আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞকে (Jurist) কমিশনের কাজে সম্পৃক্তকরণের' দাবিও জানিয়েছিলেন।

বিভিন্ন দলে ও মতে বিভক্ত '৭১-এর রণাঙ্গনের অধিনায়করা মুক্তিযুদ্ধের উপপ্রধান অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকারের নেতৃত্বে যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এক মঞ্চে সমবেত হলেন— আমাদের আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটেছিল, নিঃসন্দেহে আন্দোলনের ব্যাপ্তি বেড়েছিল। একই সঙ্গে বিচারের পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা আমাদের যথেষ্ট শংকিতও করেছিল। আমরা তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেছি। এর পাশাপাশি যে সব সংগঠন আমাদের আন্দোলনের শুরু থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে তাদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। আমরা ঠিক করেছিলাম 'সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম' সহ সবাই মিলে এ বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি ঘোষণা প্রদান করলে বিভ্রান্তি দূর হবে। ২০০৭-এর ২৯ ডিসেম্বর আমরা ৭১টি সংগঠন একটি ঘোষণা দিয়েছিলাম বটে তবে সেখানে 'সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম'-এর আপত্তির কারণে যুদ্ধাপরাধীদের দল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি; একই সঙ্গে জাতিসংঘে যাওয়ার অবস্থান থেকে তাদের তখন পর্যন্ত সরিয়ে আনা যায়নি।

২০০৮-এর ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট যে অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করেছে তার পেছনে 'সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের'ও ভূমিকা রয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ফোরামের নেতারা নিজেদের ফোরাম থেকে— এমনকি আমাদের নির্মূল কমিটির ব্যানারেও জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে সমাবেশ ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সহায়তা চাইবেন। আমরা মহাজোটের নীতি নির্ধারকদেরও বুঝিয়েছি '৭৩-এর আইনের মতো একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আইন থাকতে আমাদের জাতিসংঘে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি যাই বিচার আরও বিলম্বিত হবে, জটিলতাও বাড়বে। শেষ পর্যন্ত মহাজোট সরকার '৭৩-এর আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সম্মত হয়ে ট্রাইবুনাল গঠন করলেও যুদ্ধাপরাধের দায়ে ব্যক্তির পাশাপাশি রাজাকার, আলবদর বা জামায়াতের মতো সংগঠনকে বিচারের আওতায় আনার বিষয়ে আগ্রহী নয়।

১৯৭৩-এর আইনকে যুগোপযোগী করার জন্য ২০০৯ সালে সরকার আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কিছু সংস্কার করেছে। মূল আইনে যাদের বিচারের কথা

বলা হয়েছে সেখানে সশস্ত্র বাহিনী ও সহযোগী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে 'যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ' শব্দগুচ্ছ। এ বিষয়ে কয়েকজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ মনে করেন— এই ফলে সংশোধিত আইনটি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭-এর গ ধারা হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন ১৯৭৩' এর রক্ষাকবচ। এই আইনে কাদের বিচার করা যাবে তার উল্লেখ সংবিধানে রয়েছে, যেভাবে ছিল '৭৩-এর মূল আইনে। ভিন্নমতপোষণকারী সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সংশোধনীর প্রয়োজন ছিল না। শীর্ষস্থানীয় সকল যুদ্ধাপরাধী মুক্তিযুদ্ধকালে কোন না কোন দল বা বাহিনীর সদস্য ছিল, যাদের বিচার '৭৩-এর আইনেই হতে পারে। মওদুদ আহমেদ বা জামায়াতের কোন আইনজীবী যদি '৭৩-এর আইনের এই সংশোধনী চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর আদালতের শরণাপন্ন হন মামলার রায় সরকারের বিরুদ্ধে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারের উচিৎ ছিল ড. কামাল হোসেন, বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী কিংবা ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলামের মতো সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করা।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি যখন থেকে সংগঠিতভাবে উচ্চারিত হচ্ছে তখন থেকে জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা বলছে যুদ্ধাপরাধীদের বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং এত বছর পর এই ইস্যুতে জাতিকে বিভক্ত করা ঠিক হবে না। তারা আরও বলছে, '৭৩-এর আইনে তাদের বিচার করা যাবে না; যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে হলে দেশের প্রচলিত আদালতে অথবা আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে হবে। গত ১৯ বছর ধরে আমরা জামায়াত এবং তাদের সহযোগীদের এসব প্রচারণার জবাব দিচ্ছি।

১৯৭৩ সালের ১৭ মে'র প্রেসনোটে দালাল আইনে আটক যে সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তাদের জন্য সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিল। তবে সাধারণ ক্ষমার প্রেসনোটে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে— বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা, ধর্ষণ, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ১৮টি অপরাধের দায়ে দণ্ডিত ও অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রদর্শন প্রযোজ্য হবে না। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তির ভেতর প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পেয়েছিল। তারপরও ১১ হাজারের বেশি ব্যক্তি এ সকল অপরাধের দায়ে কারাগারে আটক ছিল এবং তাদের বিচারের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের দায় থেকে অব্যাহতির অজুহাত তৈরি করার জন্য জামায়াতের নেতারা '৭২-এর সিমলা চুক্তি এবং পরবর্তী ত্রিপক্ষীয় চুক্তির কথা বলেন। সিমলা চুক্তি হয়েছে '৭২-এর ২ জুলাই তারিখে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে, এতে যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছিল তার ১৩, ১৪ ও ১৫ ধারায় বলা হয়েছে— পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের

প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, যেহেতু বাংলাদেশ সরকার ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে বিচার না করে ক্ষমা করে দিয়েছে, সেহেতু তারা পাকিস্তানে ফেরত যেতে পারে।

পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন বলেছেন, যেহেতু পাকিস্তান নিজ দেশে তাদের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে কারণেই বাংলাদেশ অভিযুক্ত ১৯৫ জন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাকে বিচার না করে ছেড়ে দিয়েছে উপমহাদেশে শান্তি ও সমঝোতার বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য। এর সঙ্গে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার থেকে অব্যাহতির প্রসঙ্গ আলোচনায় আসতে পারে না। ত্রিপক্ষীয় চুক্তির পরও দালাল আইনে বাংলাদেশী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল, এবং 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইবুন্যালস) অ্যাক্ট ১৯৭৩'-ও বাতিল করা হয়নি। এ কারণেই বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি একাকার করে ফেলার কোন সুযোগ নেই। জামায়াতের শীর্ষ নেতারা তখন দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে তাদের বিচার করা যায়নি। ক্ষমা প্রসঙ্গে আইনের নীতিমালায় ও সংবিধানেও বলা আছে, রাষ্ট্রপ্রধান কখনও অপরাধের ক্ষমা করতে পারেন না, ক্ষমা করতে পারেন শুধু আদালতের দণ্ড। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমার বিষয়টির কোন আইনি ভিত্তি নেই। এই ১৯৫ জনকে ক্ষমা করা হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায়।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক আইনে একটি অবশ্যমান্য মতবাদ আছে যাকে বলা হয় 'জাস কোজেন্য' (Jus Cogens)। 'গণহত্যা', 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ', 'যুদ্ধাপরাধ', 'দাসপ্রথা' প্রভৃতি আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ 'জাস কোজেন্য'-এর অন্তর্গত যা থেকে কোন ব্যক্তি বা সরকার কোনও অবস্থায় অব্যাহতি পেতে পারে না এবং কোনও সরকার বা আন্তরাষ্ট্রীয় চুক্তি এসব অপরাধে অভিযুক্তদের বিচার থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। ১৯৮৬ সালে গৃহীত আন্তরাষ্ট্রীয় চুক্তির আইন সংক্রান্ত 'ভিয়েনা কনভেনশন'-এ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'জাস কোজেন্য'-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে কোন চুক্তি অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

১৯৭৪-এর ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমার কথা বলা হলেও যেহেতু পাকিস্তান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের বিচার করেনি, যেহেতু আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য এবং যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী এই চুক্তি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ অনুমোদন করেনি সেই জন্য বাংলাদেশ যে কোন সময় তাদের কিংবা এই তালিকার বাইরে অন্য কোন পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তার বিচার করতে পারে যদি তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ থাকে।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের দায় এড়াবার জন্য জামায়াত বলে ১৯৫ জন মূল অভিযুক্তকে ছেড়ে দিয়ে তাদের সহযোগীদের বিচার করা যায় না। '৭১-এর 'গণহত্যা', 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ', 'শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ' ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য প্রণীত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালসমূহ) আইন ১৯৭৩'-এ মূল বাহিনী ও

সহযোগী বাহিনীর বিচারের কথা একসঙ্গে বলা হয়েছে। এ ছাড়া জামায়াতে ইসলামী '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শুধু সহযোগী ছিল না, দল হিসেবেও প্রধান অভিযুক্তদের ভেতর পড়বে, কারণ '৭১-এ দখলদার পাকিস্তানি সরকারের মন্ত্রীসভায় জামায়াতও ছিল। বহু ক্ষেত্রে জামায়াতের নির্দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছে। বিশেষভাবে রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্যরা যুদ্ধকালে যা কিছু অপরাধ করেছে তার দায় থেকে এসব বাহিনীর জন্মদাতা ও নির্দেশদাতা জামায়াত ও সহযোগী দলের নেতারা কোনও আইনেই অব্যাহতি পেতে পারেন না। নিজস্ব বাহিনীর সদস্যদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হওয়াও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ।

জামায়াত ও তাদের সহযোগীরা যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি ভুলে যেতে বলে তখন তাদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি গোপন থাকে না। তবে অনেক সময় কোন কোন বিদেশী সাংবাদিকও জানতে চেয়েছেন বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশ কেন এত বছর পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে গুরুত্ব দেবে। আমরা বলেছি বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র হতে পারে কিন্তু আমাদের সভ্যতার ইতিহাস পশ্চিমের বহু উন্নত দেশের চেয়ে প্রাচীন। যে কোন সভ্য সমাজে অপরাধীর বিচার ও শাস্তি একটি স্বাভাবিক নিয়ম, এর জন্য আইন প্রণয়ন করা হয় এবং বিচারকার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করবার জন্য আদালত গঠন করা হয়। পশ্চিমের সভ্য দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য জার্মানীর নুরেমবার্গে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করেছিল, বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছিল। এই ট্রাইবুনালে মার্কিন কৌঁসুলি জাস্টিস জ্যাকসন বলেছিলেন, তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করছেন কোন প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে নয়, যুদ্ধের অভিশাপ থেকে বিশ্বকে মুক্ত করার জন্য। যুদ্ধাপরাধের বিচার কখনও তামাদি হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে ৬৬ বছর আগে, এখনও ইউরোপ ও আমেরিকায় যুদ্ধের ভয়াবহতার উপর সাহিত্য ও শিল্পকর্ম রচিত হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধের তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে এবং যুদ্ধাপরাধীদের খুঁজে বের করে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। ২০১০-এর ডিসেম্বরে ৯৭ বছরের একজন নাৎসি যুদ্ধাপরাধীকে খুঁজে বের করে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে দেশে দেশে মানুষ সোচ্চার হচ্ছে। পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী জনগণও এখন '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাইছে। কারণ তারা এটা বুঝতে পেরেছে গণতন্ত্রের নিরলস চর্চা ছাড়া পাকিস্তানের পরিত্রাণের অন্য কোনও পথ নেই। '৭১-এর গণহত্যা, জঙ্গী মৌলবাদ ও সমরতন্ত্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তানের যে ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে, যেভাবে পাকিস্তানকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে— সেখানকার সচেতন মানুষ যদি উপলব্ধি করতে পারে বাংলাদেশ কেন তা পারবে না?

আমরা এ কথা বহু বার বলেছি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আমরা চাই কোনও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নয়। তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করার জন্য, তাদের পরিবারবর্গের দুঃসহ যাতনা কিছুটা হলেও লাঘব করার জন্য,

সভ্যতার বোধ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সর্বোপরি যুদ্ধ নামক অভিশাপ থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করার জন্য।

গত মাসে (১৬ ডিসেম্বর ২০১০) যুদ্ধাপরাধের দায়ের অভিযুক্ত সাকা চৌধুরীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে হরতাল ডেকে বিএনপি জানিয়ে দিয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিঘ্নিতকরণের চক্রান্তে তাদের ও জামায়াতের অবস্থান অভিন্ন। অবশ্য বছরের শুরুতে বিএনপিপ্রধান খালেদা জিয়া বলেছেন বিএনপিও নাকি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। তবে তার বিবেচনায় যুদ্ধাপরাধী সাকা-নিজামী-গো. আযম গং নয়, আসল যুদ্ধাপরাধীরা সব আওয়ামী লীগে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চারপাশে ঘুরঘুর করছে। আমরা খালেদা জিয়াকে বলছি, আওয়ামী লীগে কারা যুদ্ধাপরাধী তাদের নাম ও তথ্যপ্রমাণ দিন, শহীদজননী জাহানারা ইমামের আন্দোলনের নেতাকর্মীরা তাদের বিচারের দাবিতেও সোচ্চার হবে। যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে হরতাল ডেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাওয়ার মতো ইয়ার্কি ও ভণ্ডামি বিএনপির জন্য নতুন কিছু নয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার থেকে প্রথম দফায় অব্যাহতি দিয়েছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের পর দালাল আইন প্রণয়ন করে বঙ্গবন্ধুর সরকার ৭৩টি ট্রাইবুনালে '৭১-এর ঘাতক-দালাল-যুদ্ধাপরাধীদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় এসব ট্রাইবুনালে ৭৫২ জন যুদ্ধাপরাধীর সাজাও হয়েছে যার ভেতর কযেকজনকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জিয়া ক্ষমতায় এসে দালাল আইন বাতিল করে সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধীদের শুধু মুক্তিই দেন নি, তাদের নিয়ে দল করেছেন এবং মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বানিয়েছেন। জিয়ার নীতি অনুসরণ করে খালেদা জিয়া ঘোষণা দিয়েছেন বর্তমান মহাজোট সরকার যা করছে বা করবে তিনি ক্ষমতায় গেলে সব বাতিল করে দেবেন। শুধু তাই নয়, যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ সরকারকে সহযোগিতা করছে তাদেরও তিনি দেখে নেবেন। খালেদা জিয়ার এহেন বক্তব্য আমরা ফ্যাসিসুলভ বলতে পারি, উন্মাদনাও বলতে পারি; তবে বাংলাদেশে অপরাধীদের সাজা থেকে দায়মুক্তির বর্বর দৃষ্টান্ত বিএনপিই চালু করেছে প্রথমে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের জন্য ইনডেমনিটি জারি করে, পরে দালাল আইন বাতিল করে।

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতে যাচ্ছে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক প্রণীত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন'-এ। এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত নুরেমবার্গ ট্রায়াল, টোকিও ট্রায়াল ও ম্যানিলা ট্রায়ালের মডেলে। তুলনা করলে দেখা যাবে সেই সব বিচারের ক্ষেত্রে যে আইন, নীতি ও বিধান অনুসরণ করা হয়েছিল বাংলাদেশের আইন তার চেয়ে অনেক বেশি মানসম্পন্ন। তারপরও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই আইন সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে এতে নাকি যুদ্ধাপরাধীদের মানবাধিকারকে কোন গুরুত্বই দেয়া হয়নি এবং এই আইন নাকি সংবিধানের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। অথচ বাংলাদেশের আইনে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে অভিযুক্তদের সুপ্রিম কোর্টে আপিলের সুযোগ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে, যা নুরেমবার্গ ও টোকিওতে ছিল না। তারপরও জামায়াত এবং তাদের

সহযোগীরা ক্রমাগত বলছে এই আইনে অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেয়া হয়নি।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠনের অনেক আগে থেকে জামায়াতে ইসলামী দাবি করছে তাদের দলের কেউ '৭১-এর গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। 'বাংলাদেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই। ...এদেশে কখনও যুদ্ধাপরাধের ঘটনা ঘটেনি'— ২০০৭-এর ২৫ অক্টোবরে এমন সব কথা বলে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ গণমাধ্যমে হইচই বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে দল হিসেবে জামায়াত রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছে জিয়াউর রহমানের আমল থেকে। তখন থেকে জামায়াতের নেতারা ক্রমাগত বলছেন '৭১-এ তারা কোন ভুল করেননি। '৭১-এর কৃতকর্মকে জামায়াত এখনও মনে করে তখন তারা যা করেছে সবই ছিল দলের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যা কিছু প্রয়োজন বলে জামায়াত রাজনৈতিকভাবে সঠিক বলে বিবেচনা করেছে সবই তারা করেছে, যার ভেতর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধসহ মানবতাবিরোধী যাবতীয় অপরাধ রয়েছে। '৭১-এ জামায়াত কী করেছে তার বিবরণ অন্যান্য দৈনিক পত্রিকায় যেমন রয়েছে জামায়াতের দলীয় পত্রিকা দৈনিক 'সংগ্রাম'-এও তখন প্রকাশিত হয়েছে।

তারপরও আমরা বলেছি জামায়াত যদি এসব অপরাধ না করে থাকে তাহলে বিচারের বিরোধিতা কেন করছে? তাদের উচিৎ হবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনালকে স্বাগত জানানো, কারণ তারা যদি নিরাপরাধ হয় সেটা প্রমাণের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে এই ট্রাইবুনাল। এই বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত পর্যবেক্ষক আসবেন। বিচারের স্বচ্ছতা ও মান তারা নিশ্চয়ই দেখবেন। বিচার না হলে কেয়ামত পর্যন্ত জামায়াতকে '৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের দায় বহন করতে হবে। জামায়াত জানে তাদের অপরাধের শত সহস্র প্রমাণ রয়েছে এবং বিচার হলে শাস্তি অনিবার্য তাই বিচার বানচাল করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সরকারপক্ষের আইনজীবীরা জামায়াতকে চিঠি দিয়েছিলেন '৭১-এর 'দৈনিক সংগ্রাম'-এর কপি ট্রাইবুনালকে দেয়ার জন্য। জামায়াত বা 'সংগ্রাম' কর্তৃপক্ষ এ চিঠির জবাব দেয়ারও প্রয়োজন মনে করেনি। গত কুড়ি বছরে জামায়াতের মুক্তিযুদ্ধকালীন কার্যক্রম জানার জন্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বা বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারে যখনই দৈনিক সংগ্রাম-এর খোঁজ করেছি তখন দেখেছি নয় মাসের 'সংগ্রাম' কোথাও অক্ষত নেই। সুপরিকল্পিতভাবে জামায়াত তাদের দলীয় মুখপত্র থেকে '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বহু প্রমাণ কেটে নষ্ট করে ফেলেছে।

নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালের গঠন প্রক্রিয়া এবং এর মান সম্পর্কে অনেকে তখন অনেক কথা বলেছেন। নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের উকিলরা বলেছিলেন এই ট্রাইবুনালে তারা ন্যায় বিচার পাবেন না। তারপরও বিচার চলাকালে কয়েকজন শীর্ষ নাৎসি নেতা এই

ট্রাইবুনালকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। নাৎসি নেতা হ্যান্স ফ্র্যাঙ্ক ছিলেন অধিকৃত পোল্যান্ডের গভর্ণর জেনারেল। তিনি বলেছেন, 'আমার বিবেচনায় এই বিচার হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন আদালতে, যেখানে এডলফ হিটলারের আমলের দুঃসহ যাতনার পর্যালোচনা ও সমাপ্তি ঘটবে।' হিটলারের যুদ্ধসামগ্রী নির্মাণ মন্ত্রী এ্যালবার্ট স্পীয়ার বলেছেন, 'এই বিচার জরুরি। এমনকি একটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এসব ভয়াবহ অপরাধের সম্মিলিত দায়িত্ব থাকে।' অভিযুক্তদের একজন আইনজীবী ড. থিয়োডর ক্লেফিশ লিখেছেন, 'এই ট্রাইবুনালের বিচার প্রক্রিয়া ও রায় সর্বোচ্চ পক্ষপাতহীনতা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়বোধ দাবি করে। নুরেমবার্গ ট্রাইবুনাল এই সব দাবি মর্যাদার সঙ্গে পূরণ করেছে। এই বিশাল বিচারযজ্ঞের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সত্য ও ন্যায় অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে কারও ভেতর কোন সন্দেহ না থাকে।' ('রবার্ট জ্যাকসন এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস', প্রফেসর হেনরি টি কিং, রবার্ট জ্যাকসন সেন্টার, ১ মে ২০০৩)

পশ্চিমের দেশসমূহে জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা '৭৩-এর আইন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমালোচনা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও ফোরামে উত্থাপন করছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার জন্য। ২০১০-এর জানুয়ারিতে 'ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশন' (আইবিএ) বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আইন 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট' (আইসিসি)-এর সমমানে উত্তীর্ণ করার জন্য ১৭টি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিল। তারা একাধিক আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে এ বিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নবিদ্ধ ও বিঘ্নিত করার জন্য বহির্বিশ্বের যে সব তৎপরতা চলছে মহাজোট সরকার সে বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ও উদ্বিগ্ন নয়। বরং মন্ত্রীরা প্রায়শঃ বলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে বাইরে কোন চাপ নেই। ২০১০-এর ২০ জুন আমরা ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন করে বহির্বিশ্বের এসব প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েছি। নির্মূল কমিটির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ তার তরুণ সহকর্মীদের নিয়ে সম্মেলন উপলক্ষে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।

আইবিএ '৭৩-এর আইন সম্পর্কে এমন কিছু প্রশ্ন করেছে যা নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময়ও করা হয়েছিল এবং এর জবাবও সেই সময় দেয়া হয়েছিল। একটি বহুল উচ্চারিত প্রশ্ন হচ্ছে বাদী যদি আদালত গঠন, আইন প্রণয়ন এবং বিচারক নিয়োগ করে তাহলে সেই আদালতে নিরপেক্ষ হবে কীভাবে। নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের আইনজীবীদের অভিযোগ ছিল ট্রাইবুনালের বিচারকদের সম্পর্কে অনাস্থা আনার অধিকার অভিযুক্তকে দেয়া হয়নি। শুধু নুরেমবার্গে নয়, টোকিও ও ম্যানিলা ট্রাইবুনাল সম্পর্কেও এসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল।

পৃথিবীর সব দেশে সব বিচার ব্যবস্থায় আদালতের বিচারক নিয়োগ করে রাষ্ট্র। প্রচলিত আদালতে যে কোন অভিযুক্ত বলতে পারেন তিনি 'ক' বা 'খ' নামক বিচারকের আদালতে ন্যায়বিচার পাবেন না। এ ক্ষেত্রে অন্য আদালতে যাওয়ার এখতিয়ার তার রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত আদালতেও বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার

অধিকার বাদী-বিবাদী কোন পক্ষের থাকে না। এ বিষয়ে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক এ এল গুডহার্ট লিখেছেন, 'তত্ত্বগতভাবে এই যুক্তি আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, তবে তা যে কোন দেশের বিচারব্যবস্থার পরিপন্থী। এই যুক্তি মানতে হলে কোন দেশ গুপ্তচরদের বিচার করতে পারবে না। কারণ যে দেশের আদালতে সেই গুপ্তচরের বিচার হবে সেখানকার বিচারক তার শত্রুদেশের। এ ক্ষেত্রে কেউ নিরপেক্ষতার কথা বলতে পারে না। বন্দি গুপ্তচর বিচারকদের নিকট ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করতে পারে কিন্তু কোন অবস্থায় তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে না। লর্ড রীট যেমন বলেছেন একই নীতি সাধারণ ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। একজন চোর নিশ্চয়ই অভিযোগ করতে পারে না তার বিচার কেন সৎ লোকেরা করছে।' ('দি লিগ্যালিটি অব নুরেমবার্গ ট্রায়ালস', জুডিশিয়াল রিভিউ, এপ্রিল ১৯৪৬)

আইবিএ-র প্রস্তাব অনুযায়ী ট্রাইবুনালের বিচারকদের প্রতি অভিযুক্তদের অনাস্থা আনার সুযোগ যদি দেয়া হয় তাহলে তাদের পছন্দমতো বিচারক খুঁজে বের করার জন্য আমাদের পাকিস্তানে অথবা সৌদি আরবে যেতে হবে। আইবিএ আরও প্রস্তাব করেছে ট্রাইবুনালের তিনজন বিচারক একমত না হলে রায় ঘোষণা করা যাবে না, যা বাংলাদেশের নয়, যে কোনও দেশের বিচারব্যবস্থার পরিপন্থী। পৃথিবীর সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলার রায় দেয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত হয়েছিল 'টোকিও ট্রাইবুনাল'। এই ট্রাইবুনালের অন্যতম বিচারক ছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী কুষ্টিয়ার রাধাবিনোদ পাল। তিনি এই ট্রাইবুনালে জাপানের পাশাপাশি গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে আমেরিকার বিচারও দাবি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং জাপানের আত্মসমর্পণের পর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকা দুই লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করেছে। তাঁর এই বক্তব্য আদালত গ্রহণ করেনি। তিনি টোকিও ট্রাইবুনালের রায়ের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন যা ট্রাইবুনালের ধারাবিবরণী ও রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০ জানুয়ারি (২০১১) যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন র‍্যাপ চার দিনের এক সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে এবং এ বিষয়ে তার মতামত জানাতে। স্টিফেন র‍্যাপ সিয়েরা লিওন-এর মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান আইনজীবী ছিলেন। বাংলাদেশে আগমনের প্রথম দিনই তিনি আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পরে তিনি আইনমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, এমনকি জামায়াতের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন।

'৭৩-এর আইন ও ট্রাইবুনালের কার্যবিধি সম্পর্কে স্টিফেন র‍্যাপ যে সব প্রশ্ন তুলেছেন প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন গত বছর তুলেছিল 'ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশন', যার মোদ্দা কথা হচ্ছে— যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বাংলাদেশের '৭৩-এর আইন যথেষ্ট নয়, হেগ-এর 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত' (আইসিসি)-এর

নীতি ও কার্যপ্রণালীর সঙ্গে ঢাকার 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল'-এর আইন ও বিধিমালা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রাষ্ট্রদূত র‍্যাপ মনে করেন বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আইন ও বিধিমালা আইসিসির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ।

এ কথা আমরা আইবিএ-এর অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বলেছি, রাষ্ট্রদূত র‍্যাপকেও বলেছি, যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশ আইসিসিকে অনুমোদন দেয়নি। গত বছর বাংলাদেশ দিয়েছে আইসিসির সভাপতির বিশেষ অনুরোধে। আইসিসির সভাপতি ২০১০-এর মার্চে ঢাকায় এসে বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বাস দিয়েছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে আইসিসি বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, বিনিময়ে তিনি চান বাংলাদেশ আইসিসিকে অনুমোদন দিক। আইসিসির বিধানেই বলা আছে একে অনুমোদনের অর্থ এই নয় যে, সর্বক্ষেত্রে অনুমোদনকারীকে আইসিসির আইন অনুযায়ী বিচার করতে হবে। প্রত্যেক দেশের বিচার ব্যবস্থা এবং আইনের নিজস্ব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য থাকে যার সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি অন্যান্য দেশ ও সংস্থার শ্রদ্ধা থাকা উচিৎ। তাছাড়া বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের ঘটনা ঘটেছে আইসিসি গঠনের তিন দশকেরও অধিক সময় পূর্বে। আইসিসির সনদে পরিষ্কার বলা হয়েছে, তারা অতীতের কোন অপরাধের বিচার করতে পারবে না। '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে আইসিসি'কে মান্য করার কোন বাধ্যবাধকতা বাংলাদেশের উপর আইসিসি বা অন্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তি চাপিয়ে দিতে পারেন না। এটা আইসিসি-র নীতিমালার পরিপন্থী এবং বাংলাদেশের স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রিয় সার্বভৌম সত্তার প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাস্থা প্রকাশের শামিল।

গত ১৯ বছর ধরে আমরা বলছি '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। 'যুদ্ধাপরাধ' বলতে আমরা 'গণহত্যা', 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ', 'শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ' সহ '৭৩-এর আইনে বর্ণিত সকল অপরাধকে বোঝাই। '৭১-এর অধিকাংশ যুদ্ধাপরাধী বাংলাদেশের নাগরিক। তবে অনেক যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানের নাগরিক, কেউ কেউ বর্তমানে ইংল্যান্ড ও আমেরিকারও নাগরিক। প্রথম পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশে অবস্থানকারী শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই, যাদের বিরুদ্ধে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলা ও থানা পর্যায়ের এবং পাকিস্তানি ও অন্য দেশে অবস্থানকারীদের বিচার হবে। যেহেতু অপরাধ সংঘটনের স্থল বাংলাদেশ, অপরাধীরা এবং অপরাধের শিকার বা ভিকটিমরা বাংলাদেশের নাগরিক, যেহেতু বাংলাদেশে এসব আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নিজস্ব আইন আছে যা প্রণীত হয়েছে নুরেমবার্গ-টোকিও-ম্যানিলা ট্রায়ালের সময় অনুসৃত নীতিমালা, আইন ও বিধান অনুযায়ী, যেহেতু বাংলাদেশের নিজস্ব আইনব্যবস্থা এবং উপযুক্ত বিচারক-আইনজীবী-তদন্ত সংস্থা রয়েছে, সেহেতু '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অধিকার বাংলাদেশের। পাকিস্তান বা অন্য দেশ চাইলে, তাদের আইনে সুযোগ থাকলে তারা '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে পারে তবে প্রধান অধিকার বাংলাদেশের— এ ক্ষেত্রে কোন বিভ্রান্তি থাকা উচিৎ নয়। বিচার হবে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে স্বজনহারা, নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি ন্যায়বিচার

নিশ্চিতকরণের জন্য। ৪০ বছর ধরে '৭১-এর যুদ্ধের ভুক্তভোগীরা, সন্তানহারা পিতামাতারা, পিতৃমাতৃহীন সন্তানরা, ভাই-বোনহারা, প্রিয়জনহারা কয়েক কোটি মানুষ বিচারের অপেক্ষা করছে। মানবাধিকারের কথা বলে, সংবিধান ও আইনের মারপ্যাচ দেখিয়ে খুনিরা অব্যাহতি পেতে চাইবে কিন্তু কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষের উচিৎ হবে না খুনিদের তথাকথিত মানবাধিকারের দাবি বা আইনের মারপ্যাচে বিভ্রান্ত না হওয়া। আমরা তাদেরই বিচার চাই যাদের অপরাধের পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। বিচারের নামে বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ আমরা কাউকে দেব না। আমরা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে চাই। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য অপরাধীকে মুক্তি দেয়া নয়, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ প্রতিষ্ঠা করা, সমাজ থেকে অপরাধের মূল উৎপাটন করা।

গত ১০ জানুয়ারি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় স্টিফেন র‍্যাপ জানিয়েছেন যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারে তাদের আপত্তি নেই। তবে এ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ দলকে দায়ী করে সেই দলকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিৎ হবে না বলে তিনি মনে করেন। আমাদের একাধিক মন্ত্রীও বলেছেন তারা কোন রাজনৈতিক দলের বিচার করবেন না, তারা শুধু যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কয়েকজন ব্যক্তির বিচার করবেন।

'৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশের জন্য যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক মার্কিন বিশেষ রাষ্ট্রদূত র‍্যাপকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বলেছি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কোথাও কখনও বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল না, এখনও নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যতগুলো বিচার হয়েছে বহু কারণে সবচেয়ে আলোড়িত ও গুরুত্বপূর্ণ বলা হয় নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত নুরেমবার্গ ট্রাইবনালকে। এই ট্রাইবুনালের প্রধান আইনজীবী ছিলেন আমেরিকার জাস্টিস রবার্ট জ্যাকসন। এই ট্রাইবুনালে প্রথম দফায় যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ২৪ জন শীর্ষ নাৎসি নেতার বিচারের পাশাপাশি ৭টি সংগঠনেরও বিচার হয়েছিল, যাদের ভেতর রয়েছে 'গেস্টাপো (নাৎসি গুপ্ত পুলিশ), 'এসএস' (বন্দিনির্যাতন শিবির পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত), এসএ (ঝটিকা বাহিনী) প্রভৃতি। মার্কিন চীফ প্রসিকিউটর জাস্টিস জ্যাকসন ব্যক্তির পাশাপাশি সংগঠনের বিচারের যৌক্তিকতা নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা সব সময় বলছি গো.আযম-নিজামী-মুজাহিদ গং '৭১-এ যে যুদ্ধাপরাধ করেছেন সেসব তাদের ব্যক্তিগত অভিপ্রায় বা অসূয়াপ্রসূত নয়, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই তারা হিটলারের 'গেস্টাপো' ও 'এসএ'-এর আদলে 'রাজাকার', 'আলবদর' প্রভৃতি বাহিনী গঠন করেছেন। তাদের দলের দর্শন— যা 'মওদুদিবাদ' নামে পরিচিত তা নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের সমার্থক, ধর্মের নামে গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, ও লুণ্ঠনকে বৈধতা দেয়। আমাদের ট্রাইবুনালে '৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির পাশাপাশি এসব দল বা সংগঠনের বিচার না হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, ভুক্তভোগীদের বঞ্চিত করা হবে ন্যায়বিচার লাভের সর্বজনীন অধিকার থেকে।

রাষ্ট্রদূত র‍্যাপকে এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দিয়েছি, যা আমাদের সরকারের নীতি নির্ধারকদেরও ধারণা স্বচ্ছ করবে। '৭১-এর ১৫ ডিসেম্বর বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আলিম চৌধুরীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় আলবদরের ঘাতকরা। তাঁর সহধর্মিণী শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীকে মুসলিম লীগ নেতা মওলানা আবদুল মান্নান বলেছিলেন, ডাঃ আলিম চৌধুরীকে নিয়ে গেছে আলবদররা, যার তার ছাত্র। তাঁকে নেয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য, যথাসময়ে ফেরত দিয়ে যাবে। ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের আগে আলবদররা যাদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল দু একজন ছাড়া সবাইকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। বিজয়ের দুদিন পর ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে ডাঃ আলিম চৌধুরীর ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া গেছে।

ডাঃ আলিম চৌধুরী হত্যা মামলার প্রধান আসামী মওলানা মান্নান। শুধু আলিম চৌধুরী নয়, চাঁদপুরের বহু মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও মুক্তিকামী বাঙালিকে হত্যার নির্দেশদাতা ছিলেন মওলানা মান্নান। ২৮ ডিসেম্বর (২০১০) নির্মূল কমিটির একটি আলোচনা সভায় ডাঃ আলিম চৌধুরীর কন্যা ডাঃ নুজহাত চৌধুরী শম্পা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনাল এবং সমগ্র জাতিকে একটি প্রশ্ন করেছেন। কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে ডাঃ নুজহাত বলেছেন, আমার বাবার হত্যাকারী হিসেবে আমরা জানি ব্যক্তি মওলানা মান্নানকে এবং ঘাতক বাহিনী আলবদরকে। হুকুমের আসামী মওলানা মান্নান মারা গেছেন। ট্রাইবুনাল মৃত ব্যক্তির বিচার করবে না। কিন্তু ট্রাইবুনাল যদি আমার বাবা এবং তার মতো শত শত পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য আলবদরের বিচার না করে তাহলে কি আমরা কখনও ন্যায়বিচার পাব না?

নির্মূল কমিটির সেই আলোচনা সভায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের প্রধান প্রসিকিউটর এডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু ছিলেন অন্যতম বক্তা। উপস্থিত ছিলেন ট্রাইবুনালের অন্যান্য আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তারা। নুজহাতের প্রশ্ন উপস্থিত সবাইকে ব্যথিত করেছে, কেউ উত্তর দিতে পারেন নি। কারণ সরকারের কোনও প্রতিনিধি সেখানে ছিলেন না। ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে ব্যক্তির পাশাপাশি সংগঠনের বিচার হবে কি না এই সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার সরকারের, কারণ ট্রাইবুনালের বাদী হচ্ছে সরকার। নুজহাত বা আমরা সাক্ষী হতে পারি যদি ট্রাইবুনাল আমাদের সাক্ষ্য প্রয়োজন মনে করে।

রাষ্ট্রদূত স্টিফেন র‍্যাপকে আমি আমেরিকার বিখ্যাত ইয়েল ইউনিভার্সিটির 'সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ'-এর পরিচালক এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক বেন কিরনানের কথা বলেছি। বেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ, যার বহুল আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'ব্লাড এ্যান্ড সয়েল ঃ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অব জেনোসাইড এ্যান্ড এক্সটার্মিনেশন ফ্রম স্পার্টা টু দারফুর।' এই গ্রন্থে '৭১-এ বাংলাদেশের গণহত্যার উপর একটি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যাপক বেনকে আমি ২০০৮ সালে আমার প্রামাণ্যচিত্র 'যুদ্ধাপরাধ ৭১'-এর জন্য এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছেন '৭১-এর গণহত্যার জন্য পাকিস্তানি জেনারেলদের এবং জামায়াতে ইসলামীর বিচার না করার ফলে এদের শক্তি ক্রমশঃ বেড়েছে এবং এরাই পরবর্তীকালে

আলকায়দার জন্ম দিয়েছে, আলকায়দার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করেছে। '৭১-এর গণহত্যাকারীদের বিচার থেকে অব্যাহতি আলকায়দাকে আরও গণহত্যায় অনুপ্রাণিত করেছে। বেন তার প্রবন্ধেও '৭১-এর গণহত্যার দায় থেকে অব্যাহতির সঙ্গে আলকায়দার উত্থানকে যুক্ত করেছেন। কম্বোডিয়ায় ৩৫ বছর পর যুদ্ধাপরাধের জন্য ট্রাইবুনাল গঠনের অন্যতম স্থপতি হচ্ছেন অধ্যাপক বেন কিরনান।

যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিফেন র‍্যাপ-এর বাংলাদেশ সফরের আগেও যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা এবং সরকারের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারকে বলেছেন যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি নেই তবে সেই ব্যক্তির রাজনৈতিক সংগঠনকে যেন বিচারের আওতায় না আনা হয়।

মার্কিন সরকারের নীতি নির্ধারকরা সম্ভবত আশঙ্কা করছেন '৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের যথাযথ বিচার হলে যুক্তরাষ্ট্র অপরাধের সহযোগী হিসেবে ফেঁসে যেতে পারে। যে কারণে বসনিয়া, রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন ও কম্বোডিয়ায় গণহত্যার বিচারে আগ্রহী হলেও কোরিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে তারা টু শব্দটি করেন না। রাষ্ট্রদূত স্টিফেন র‍্যাপের বক্তব্য থেকে যে কারও মনে হতে পারে— জামায়াতের কয়েকজন নেতার বিচারের বিনিময়ে তারা চান যুদ্ধাপরাধের দায় থেকে জামায়ত মুক্তি পেয়ে 'মডারেট ইসলামিক' দল হিসেবে অতীতের মতো তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকুক।

'৭১-এর যুদ্ধাপরাধের দায় থেকে সংগঠনকে আমরা অব্যাহতি দেব কি দেব না এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বর্তমান মহাজোট সরকারকে। আমরা আমাদের আন্দোলনের শুরু থেকে বলছি— '৭২-এর সংবিধানে বঙ্গবন্ধু ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। যার ফলে সংবিধানিকভাবে '৭১-এ পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের প্রধান সহযোগী জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি ধর্মব্যবসায়ীদের দল নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। জিয়াউর রহমান সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতলবে বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সংবিধানের মূলনীতিসমূহ খারিজ করে যুদ্ধাপরাধী জামায়াতিদের রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। জামায়াতের রাজনীতি গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও লণ্ঠনকে বৈধতা দেয়, এসব নৃশংস অপরাধের ক্ষেত্র তৈরি করে। জামায়াত ও সমচরিত্রের দল নিষিদ্ধ না হলে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কখনও বাস্তবায়িত হবে না। রাজাকার, আলবদর, আলশামস-এর বিচার ছাড়া '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রহসনে পরিণত হবে।

সরকারের নীতি নির্ধারকদের কেউ কেউ সমঝোতা করে ক্ষমতায় থাকার কথা ভাবতে পারেন। মোল্লারা দাবি করছেন ২৬ ডিসেম্বরের (২০১০) হরতালকে কেন্দ্র করে নাকি শিক্ষানীতি ও '৭২-এর সংবিধান নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাদের সমঝোতা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিলের ফলে ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ হলেও সরকারের নীতি নির্ধারকরা বলছেন তারা ধর্মের নামে রাজনীতি

নিষিদ্ধ করবেন না। মৌলবাদের সঙ্গে সমঝোতার কারণে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'ও সরকার বাতিল করেনি যা সংবিধানের মূল নীতির পরিপন্থী। গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সংগঠনের বিচার না করাও এক ধরনের সমঝোতা ছাড়া আর কিছু নয়। অতীতে আমরা দেখেছি শুধু বাংলাদেশে নয়, পাকিস্তানে ও আফগানিস্তান সহ মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় যারা মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলতে চেয়েছে তারা তাদের দেশ ও জাতির জন্য সমূহ বিপদ ডেকে এনেছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে দশ মাস আগে, এখনও পর্যাপ্ত সংখ্যক আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। যে সামান্য সংখ্যক আইনজীবী ও কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি। এদের কেউ কেউ ঠিকমতো নাকি অফিসও করেন না—এ খবর পত্রিকায় বেরিয়েছে। বার বার বলার পরও পুরো হাইকোর্ট ভবনটি ট্রাইবুনালকে দেয়া হয়নি। এখনও সরকারের দুটি দফতর এই ভবনে রয়ে গেছে। স্থানাভাবে ট্রাইবুনালের কাজ মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। ট্রাইবুনাল এখনও আর্থিকভাবে স্বাধীন নয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে এবং বিচারিক কার্যক্রম সম্পর্কে মহাজোট সরকারের মন্ত্রীদের অজ্ঞতাপ্রসূত অবাঞ্ছিত বক্তব্য প্রদান বন্ধ না হলে ট্রাইবুনালের নিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ও সংশয় থেকেই যাবে। '৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী যারা ট্রাইবুনালের সম্ভাব্য সাক্ষী তাদের নিরাপত্তার জন্য এখন পর্যন্ত কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। সম্ভাব্য অনেক সাক্ষীকে সরকারের আইনজীবীরা ইতিমধ্যে গণমাধ্যমে যে ভাবে পরিচিত করেছেন, তার ফলে এরা এক ভীতিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। সাকা চৌধুরী গ্রেফতারের পরও হুমকি দিয়েছেন— যে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসবেন তাকে নাকি দেখে নেবেন।

'৭৩-এর আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধিতার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্ত র্জাতিক ফোরামে '৭১-এর গণহত্যা ও নারী নির্যাতন সহ মানবতাবিরোধী যাবতীয় অপরাধের ঘটনা প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। এমনকি কোথাও ভারতীয় গবেষক নিয়োগ করা হয়েছে '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদশীয় সহযোগীরা গণহত্যা বা নারীনির্যাতন করেনি তা প্রমাণের জন্য। ভারতের বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের মত নেয়া হচ্ছে '৭৩-এর আইনের বিরুদ্ধে। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের সন্তান, পরিজন ও দলের নেতারা ইউরোপ, আমেরিকা চষে বেড়াচ্ছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে দেন-দরবার করছেন— সেদিকে সরকারের কোন নজরদারি আছে বলে মনে হয় না। দেশে ও বিদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত সকল বিভ্রান্তি ও চক্রান্ত নিরসন ও মোকাবেলা করতে হবে রাজনৈতিকভাবে, কূটনৈতিকভাবে এবং আইনিভাবে। এই বিচারের বিরুদ্ধে বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা না হলে কাঙ্ক্ষিত বিচার কতটুকু সম্ভব হবে এ প্রশ্ন যে কেউ করতে পারেন। সরকারের বিভ্রান্তি আলোচনা করে নিরসন করা যাবে। জামায়াত-বিএনপির চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প কিছু নেই।

২৫ জানুয়ারি ২০১১

খালেদা জিয়ার যুদ্ধাপরাধীতত্ত্বের শানে নুজুল

'৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিএনপির একজন শীর্ষ নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওরফে সাকার গ্রেফতারের প্রতিবাদে হরতাল ডাকার মাস না পেরোতেই দলের চেয়ারপার্সন ও বিরোধী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বিএনপিও নাকি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতে শতসমস্যাকাতর আমজনতাকে অট্টহাস্যের উপলক্ষ্য সৃষ্টির জন্য ম্যাডাম জিয়াকে আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিৎ। দুঃখের বিষয় আমরা তা পারছি না কারণ, পাকিস্তানপ্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত খালেদা জিয়া যে পাকিস্তানি জেনারেলদের কিংবা জামায়াত, মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতাদের সত্যিকারের দেশপ্রেমিক মনে করেন—এটা কোন আনন্দের সংবাদ নয়। বিএনপি-জামায়াত জোট মনে করে '৭১-এর বাংলাদেশে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছে আওয়ামী লীগ ও ভারত।

বিএনপিপ্রধান খালেদা জিয়া ৩ জানুয়ারি (২০১১) তাঁর বাসভবনে বিএনপির চিকিৎসক দলের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বলেছেন, 'আমরাও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। তবে সত্যিকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। যারা সত্যিকার যুদ্ধাপরাধী তাদের কেন ছেড়ে দেয়া হয়েছিল? তাদের কেন ক্ষমা করা হলো? তাদের ধরে এনে জিজ্ঞাসা করলেই তাদের সহযোগী কারা ছিল তা বের হয়ে আসবে। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, আগে নিজের ঘরে এবং ডানে-বাঁয়ে যেসব যুদ্ধাপরাধী রয়েছে তাদের বিচার শুরু করুন।' (জনকণ্ঠ, ৪ জানুয়ারি ২০১১)

গত ডিসেম্বরে বিজয়ের মাসে খালেদার নিজের দল বিএনপি এবং তার প্রধান মিত্র জামায়াতে ইসলামী আবিষ্কার করেছে মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগ রাজাকার বাহিনী গঠন করেছে, বিজয়ের প্রাক্কালে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের হত্যার জন্য আওয়ামী লীগ ও ভারত দায়ী, শেখ হাসিনা জঙ্গী মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি। জামায়াত ও তাদের দোসর বিএনপির এ হেন বক্তব্যে আমরা বিস্মিত হইনি। বৃটিশ ভারতে জামায়াতের জন্ম হয়েছে মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে। জামায়াতের সঙ্গে দীর্ঘ সহবাসের কারণে মিথ্যাচারের কৌশল বিএনপি ভালমতোই রপ্ত করেছে।

১৯৯১ সালে জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতা করে ক্ষমতায় আসার পর থেকে খালেদা জিয়া ও তার দল বিএনপি রাজাকার আর মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা উল্টে দিয়েছেন। '৯১-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জামায়াতপ্রধান যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হবে এই সমঝোতার কারণেই জামায়াতের সমর্থন পেয়েছিল বিএনপি। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রধান সহযোগী ছিল জামায়াতে ইসলামী,

মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর গোলাম আযম '৭১-এর গণহত্যার সূচনাকালেই 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে খ্যাত পাকিস্তানি জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে বৈঠক করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। '৭১-এর ৬ এপ্রিল দেশের সকল জাতীয় দৈনিকে এই বৈঠকের ছবি ছাপা হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা প্রথমে 'শান্তি কমিটি' পরে 'রাজাকার', 'আলবদর', 'আলশামস' প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী গঠন করে। '৭১-এ গো. আযম-নিজামীদের জামায়াতে ইসলামী কীভাবে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেছে তার বহু বিবরণ জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম ও অন্যান্য দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় অনিবার্য জেনে জামায়াতের শীর্ষ নেতারা পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার আগে তাদের সৃষ্ট ঘাতক 'আলবদর' বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন তালিকা তৈরি করে দেশের সেরা বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের হত্যার জন্য। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের নিকট পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের মিত্রদের আত্মসমর্পণের পর বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে আলবদরের ঘাতকদের নৃশংসতার রোমহর্ষক বিবরণ। '৭১-এর আলবদর বাহিনীতে যোগদান জামায়াতের ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র সংঘে'র সকল সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তখন ইসলামী ছাত্র সংঘের এবং আলবদরের নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমান জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী, কামরুজ্জামান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাশেম আলী প্রমুখ।

১৯৭২-এর ২৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার দালাল আইন প্রণয়ন করে '৭১-এর ঘাতক, দালাল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল আসামীর তালিকায় জামায়াতের রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর বহু সদস্য ছিল। এদের অনেকের বিচার ১৯৭৫-এর আগেই সম্পন্ন হয়েছে। গোলাম আযম-নিজামীরা তখন পাকিস্তান আর সৌদি আরবে থাকায় তাদের গ্রেফতার বা বিচার করা যায়নি।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ৩১ ডিসেম্বর (১৯৭৫) অর্ডিন্যান্স জারির দ্বারা দালাল আইন বাতিল করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। এরপর তাদের নিয়ে প্রথমে 'জাগদল' এবং পরে 'বিএনপি' গঠন করেন। '৭১-এর শীর্ষস্থানীয় ঘাতক দালালদের জিয়াই প্রথম মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়েছেন, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও বানিয়েছেন। পরবর্তীকালে জিয়াপত্নী বেগম খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষমতার মসনদে বসেছেন।

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে খালেদা-নিজামীরা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য ও নৌকাশূন্য করবার জন্য এক নৃশংস অভিযান চালিয়েছিলেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় জন্ম দিয়েছিলেন শতাধিক জঙ্গী মৌলবাদী মৌলবাদী

সংগঠনের। গত কয়েক বছরে যে সব জঙ্গী নেতারা ধরা পড়েছে সবাই বলেছে জামায়াত-বিএনপি জোট সরকার কীভাবে জঙ্গীদের লেলিয়ে দিয়েছিল শেখ হাসিনা সহ দেশের সকল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দলের নেতা-কর্মী, মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, সংস্কৃতিকর্মী এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে হত্যার জন্য। এরপরও বিএনপি-জামায়াতের জমানায় আমরা দেখেছি যখনই জঙ্গীরা কোথাও গ্রেণেড-বোমা হামলা ও হত্যা করেছে তখনই খালেদা-নিজামীরা কোরাসে বলেছেন এসব নাকি আওয়ামী লীগ ও ভারত করেছে।

২০০২ সালের ডিসেম্বরে ময়মনসিংহের ৩টি প্রেক্ষাগৃহে একযোগে বোমা হামলা করে বহু মানুষকে হতাহত করেছিল হরকতুল জেহাদের জঙ্গীরা, পরে ধরা পড়ে কবুলও করেছে। অথচ এই বোমা হামলার কয়েক ঘণ্টার ভেতর আওয়ামী লীগের কেন্দ্র ও জেলা পযায়ের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাসহ গ্রেফতার করা হয় অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও এই অধম লেখককে। রিমান্ডে নিয়ে আমাদের নির্যাতন করা হয়েছে এই মর্মে লিখিত জবানবন্দির জন্য— ময়মনসিংহের প্রেক্ষাগৃহ সহ সকল গ্রেণেড-বোমা হামলার জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ ও ভারত। গত মাসেও বিএনপির মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাকি জঙ্গীদের মদদদাতা। এ হেন জামায়াত-বিএনপি '৭১-এর বুদ্ধিজীবী হত্যা, রাজাকার গঠন বা যুদ্ধাপরাধের জন্য আওয়ামী লীগ ও ভারতকে দায়ী করবে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। যে কারণে ভারত পাকিস্তানের জন্মশত্রু একই কারণে বাংলাদেশের পাকিস্তানপ্রেমীদের চরম শত্রু হচ্ছে ভারত।

মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া একাধিকবার বলেছেন বিএনপি নাকি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে। পক্ষে থাকলে তারা ট্রাইবুনাল গঠনের বিরোধিতা করতেন না, '৭৩-এর 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন'-এর সমালোচনা করতেন না, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করার পর তার প্রতিবাদে হরতাল ডাকতেন না।

৩ জানুয়ারির সভায় খালেদা জিয়া বলেছেন আসল যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ম্যাডাম জিয়া কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করেন পাকিস্তানি জেনারেলরা কিংবা গোলাম আযম-নিজামীরা '৭১-এ বাংলাদেশে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? নিশ্চয়ই তিনি তা মনে করেন না। যদি করতেন '৭১-এ বাংলাদেশে অবস্থানকারী পাকি জেনারেলের মৃত্যুর পর সকল কূটনৈতিক শিষ্টাচার লংঘন করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শোকবার্তা পাঠাতেন না। তখন আমাদের পাকিস্তানি বন্ধুরাও বিব্রত বোধ করেছিলেন। সেই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেওয়াজ শরিফ। কোন দেশ পরাজিত জেনারেলের জন্য সরকারিভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে শোকপ্রকাশ করে না। সঙ্গত কারণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর শোক জানাবার কথা ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শোকবার্তার পর বাধ্য হয়ে তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকেও শোকপ্রকাশ করতে হয়েছে।

খালেদা জিয়াকে হাজারটা প্রমাণ দিলেও বিশ্বাস করানো যাবে না গোলাম আযম-নিজামী বা জামায়াতের কেউ '৭১-এর গণহত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনি বিশ্বাস করেন গোলাম আযম একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, যে কারণে ১৯৯২-এর ২৬ মার্চ গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের প্রতীকী বিচার কর্মসূচী পালনের জন্য শহীদজননী জাহানারা ইমাম সহ আমাদের ২৪ জনের বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহিতা'র মামলা দায়ের করেছিলেন। খালেদা জিয়ার সরকারের অভিযুক্ত ২৪ জন 'দেশদ্রোহী'র তালিকায় মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়করা ছিলেন, বরেণ্য বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন, 'বীরউত্তম' মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন।

১ জানুয়ারি বছরের প্রথম দিন বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া এক সমাবেশে বলেছেন আগামীতে ক্ষমতায় গেলে বর্তমান মহাজোট সরকার যা করছে সব নাকি তিনি বাতিল করে দেবেন। অনেকে রসিকতা করে বলেছেন সবার আগে তিনি তার সন্তানদের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতির মামলা বাতিল করে দেবেন এবং ক্যান্টনমেন্টের কয়েকশ কোটি টাকার সরকারি বাড়িটি আবার দখল করবেন। ৩ জানুয়ারির বক্তব্য থেকে ধারণা করা অসঙ্গত হবে না ক্ষমতায় গেলে খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া হয়ত বাতিল করবেন না, নিজামী-সাকা গংদের বিচার থেকে রেহাই দিয়ে সেই ট্রাইবুনালে যুদ্ধাপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার বিচার করবেন। আমাদের কীভাবে শায়েস্তা করবেন তার নমুনা তো তিনি ২০০১ ও ২০০২-এ ক্ষমতায় থাকাকালে দেখিয়েছেন।

খালেদা জিয়া দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের ভেতর যুদ্ধাপরাধী আছে। আমরা যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গত চার দশক আন্দোলন করছি সঙ্গত কারণেই চাইব— তিনি যেন আওয়ামী লীগের যুদ্ধাপরাধীদের নাম ও তথ্যপ্রমাণ জাতির সামনে হাজির করেন। যদি গো. আযম-নিজামী-সাকার মতো যুদ্ধাপরাধী শেখ হাসিনার আশাপাশে থাকে আমরা কথা দিচ্ছি তাদের বিচারের জন্যও আমরা আন্দোলন করব। আমাদের 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে '৭১-এর প্রধান প্রধান ঘাতক-দালাল রাজাকারদের তালিকা তৈরি করে শহরের কেন্দ্রে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। কুষ্টিয়ায় নির্মূল কমিটির সভাপতি এডভোকেট বায়েজিদ আব্বাস, যিনি একই সঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগেরও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তাঁর পিতা এডভোকেট আজিজুর রহমান আব্বাস বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে রাজনীতি করেছেন, ১৯৭০-এ তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়া থেকে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বৃহত্তর কুষ্টিয়ায় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কুষ্টিয়ায় আমরা রাজাকারদের যে তালিকা শহরের মাঝখানে ঘৃণাচত্বর নির্মাণ করে ঝুলিয়ে দিয়েছি তার প্রথম নাম হচ্ছে শাহ আজিজুর রহমানের, জেনারেল জিয়া যাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। তালিকার দ্বিতীয় নাম হচ্ছে এডভোকেট সাদ আহমেদের, সম্পর্কে যিনি বঙ্গবন্ধুর সহযোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট আজিজুর রহমান আব্বাসের মামাশ্বশুর। এই তালিকায় জেলা আওয়ামী লীগের আরও কয়েকজন নেতার আত্মীয়স্বজন রয়েছে যে

তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন কুষ্টিয়ার আওয়ামী লীগ ও নির্মূল কমিটির নেতা এডভোকেট বায়েজিদ আক্কাস।

খালেদা জিয়া বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতারে নাকি রাজনীতি করা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। গ্রেফতারকৃত সাকা সব সময় নিজেকে শেখ হাসিনার ভাই বলে দাবি করেন। গ্রেফতারের পর তিনি এমন কথাও বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে নাকি তাকে এই সরকার গ্রেফতার করতে পারত না। তিনি আরও বলেছেন— তার গ্রেফতার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নাকি কিছু জানতেন না। সাকার বক্তব্য অনুযায়ী এটাই সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে— মহাজোট সরকার যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথাকথিত ভাইকেও রেহাই দিচ্ছে না!

আমরা দাবি জানিয়েছি এবং সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে— প্রথমে শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে, পরে জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়েও বিচার হবে, যদি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ থাকে। খালেদা জিয়া যদি সত্যি সত্যি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান তাহলে তথ্য প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করুন— আওয়ামী লীগের কোন নেতা যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নইলে এটাই প্রমাণ হবে আপনারা যে কঠোর আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছেন সেটা প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাবার জন্য, বিচার প্রক্রিয়া বানচাল করবার জন্য, ১৯৭১ ও ২০০৮-এর শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তান বানাবার জন্য। খালেদা জিয়ারা হরতাল ডেকে মনের সুখে বাস পোড়াতে পারেন, যত খুশি জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মারতে পারেন— জনতার রুদ্ররোষ থেকে একদিন তারা যে রেহাই পাবেন না এটা ইতিহাসের আমোঘ সত্য।

৪ জানুয়ারি ২০১১

বিজয়ের মাসে জামায়াতের ঔদ্ধত্য ও উন্মাদনা

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে— 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'। এ কুকুর সায়েব-সুবোদের পোষা নয়, রাস্তার নেড়ি কুকুর। মাথায় ঘা হলে নেড়ি কুকুর যাকে তাকে কামড়াতে চায়, ধমক দিলে দূরে গিয়ে কেঁউ কেঁউ করে। '৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের দংশন জল্লাদ ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার দোসর জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের মাথায় এমন ঘা তৈরি করেছে যে সারাক্ষণ সেখানে সাদা সাদা ক্রিমিকিট কিলবিল করছে। ঘায়ের পচন মাথা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বাঙ্গে। নইলে বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে জামায়াতের নেতারা এমন উন্মাদ আচরণ কেন করবেন।

তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বাংলাদেশে কয়েকটি দিন এমনই গৌরব ও আনন্দের যে সেই সব দিনকে কেন্দ্র করে সারা দেশ উৎসবের জোয়ারে ভেসে যায়। এই দিনগুলো হচ্ছে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৫ এপ্রিল বা ১ বৈশাখ বাংলা নববর্ষবরণ এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এই দিনগুলো হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান-বাঙালি-আদিবাসী নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষের। সকল মানুষ বলতে আমরা সেই মানুষদের বোঝাই— যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে, যারা গণতন্ত্র ও মানবিকতার পূজারি। যারা '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ইসলামের দোহাই দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী বাঙালিদের 'ভারতের এজেন্ট', দুস্কৃতকারী', 'নমরুদ', 'ইসলামের দুষমন' ইত্যাদি বলত; যারা ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে 'রাজাকার'-'আলবদর'-আলশামস' প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী গঠন করে গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও লুণ্ঠন সহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী দুষ্কর্মে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের জন্য এই সব দিন ও এই সব মাস হাবিয়া দোজখ বা রৌরব নরকতুল্য।

বছর ঘুরে স্বাধীনতার মাস, ভাষার মাস ও বিজয়ের মাস এলেই জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের দোসরদের নরকযন্ত্রণা আরম্ভ হয়, তারা উন্মাদের মতো আচরণ করে। ২০১০-এর বিজয়ের মাস ডিসেম্বর অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ— কারণ এ বছরই '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে এবং বিচারের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। ডিসেম্বরের আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁচজন শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীকে আর এই ডিসেম্বরে বিজয়ের ৪০তম দিবসের প্রত্যুষে গ্রেফতার করা হয়েছে অন্যতম ঘৃণিত যুদ্ধাপরাধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বা সাকা চৌধুরীকে। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে টেলিভিশনে দেখেছি, পরদিন বিভিন্ন দৈনিকেও বেরিয়েছে সাকার গ্রেফতারে সাধারণ মানুষ কী পরিমাণ

আনন্দিত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আনন্দে উদ্বেলিত মানুষ মিষ্টি বিতরণ করেছে, বলেছে— বিজয়ের মাসে শেখ হাসিনার সরকারের সেরা উপহার।

ডিসেম্বরের শুরু থেকেই শোনা যাচ্ছিল '৭১-এর ঘাতককুল শিরোমণি জামায়াতের গোলাম আযম ও বিএনপির সাকা চৌধুরী যে কোন সময় গ্রেফতার হতে পারেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাউজান, হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি পরিদর্শন করে স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে এই দুজনের অপরাধের প্রচুর তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। এর পাশাপাশি আমরা দেখছি জামায়াত ও বিএনপির নেতাদের প্রলাপোক্তির প্রতিযোগিতা। 'গিনেস বুক অব রেকর্ডস'-এ মিথ্যাচার ও প্রলাপোক্তির জন্য নাম তোলার ব্যবস্থা থাকলে বিএনপির মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার ও জামায়াতের তাবৎ নেতাদের ভেতর প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব সীমাবদ্ধ থাকত।

এবার বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জামায়াতের এক আলোচনা সভায় দলের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, 'জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী যে সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন, আমরাও সেই সেক্টরে যুদ্ধ করেছি। তিনি মুক্তিযোদ্ধা হয়ে থাকলে আমরাও মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সরকারি চাকরি করে তিনি যদি রাজাকার না হন তাহলে আমরা জনগণের পক্ষে কাজ করে কেন রাজাকার হব।' (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ ডিসেম্বর ২০১০)

জামায়াতের এই বক্তব্য নিছক উন্মাদনা নয়, চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ কদর্য মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী যদি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা করতেন পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলী ও নিজামীদের হত্যা তালিকায় কখনও তাঁর নাম থাকত না। জামায়াতের ঘাতক বাহিনী আলবদরের খুনিরা অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর অনুজ বরেণ্য অধ্যাপক ও নাট্যকার মুনীর চৌধুরীকে '৭১-এর এই ডিসেম্বরে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে হত্যা করলেও অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে পারেনি। ঘাতকরা তাঁর বাড়ি গিয়ে ফিরে এসেছিল কারণ তিনি আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কবীর চৌধুরীর মতো অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং আরও অনেকের নামও জামায়াতের হত্যা-তালিকায় ছিল, তাঁদেরও আলবদরের ঘাতকরা খুঁজে পায়নি।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের ঘাতকরা সেই সব বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে এবং হত্যা করতে চেয়েছে যাঁরা তাদের মেধা, মনন ও সৃষ্টির দ্বারা বঙালিত্বের চেতনা বিকশিত করেছেন, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার কথা বলেছেন এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। জেনারেল ফরমান আলী তার বইয়ে পাকিস্তান ভাঙার জন্য এই বুদ্ধিজীবীদেরই দায়ী করেছেন। এ কারণেই কবীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার ও মুনীর চৌধুরীর মতো জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের তালিকা তুলে দেয়া হয়েছিল আলবদরের ঘাতকদের হাতে।

১৫ তারিখের আলোচনা সভায় জামায়াতের যে নেতা নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন সেই এ টি এম আজহারুল ইসলাম ঘাতক আলবদরদের নেতা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় কী বলেছেন, কী করেছেন তার বিবরণ পাওয়া যাবে '৭১-এ জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক 'সংগ্রাম' এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের গোপন প্রতিবেদনে, যা আমাদের অনেকের লেখায় বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে জামায়াতের এই দুর্বৃত্ত যুদ্ধাপরাধী নেতাটি বলেছেন রাজাকার বাহিনী নাকি গঠন করেছে আওয়ামী লীগ। ১৭ ডিসেম্বর (২০১০) দৈনিক 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— 'ভারত বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে— স্বাধীনতার ৩৯ বছর পর হঠাৎ এমন দাবির পর এবার জামায়াতে ইসলামী দাবি করেছে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটি গঠন করেছে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যানরা। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী এই দলটির ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলাম বিজয় দিবস উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার এক আলোচনা সভায় আকস্মিক এই দাবি করেন।

'আজহারুল ইসলাম দাবি করেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের ৯৯ ভাগ চেয়ারম্যান ছিল আওয়ামী লীগের লোক। রাজাকার, শান্তি বাহিনী নিয়োগ দিয়েছে তারা আর পুলিশের এসপিরা। তারা অপরাধী হবে না আর জামায়াত নেতাদের বিচার করবে, এমন দুমুখো নীতি দেশবাসী সহ্য করবে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা করা এই দলটি ইদানীং তাদের সে সময়কার ভূমিকা অস্বীকার করে চলছে। এবারের শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবসে এসে জামায়াতের নেতারা এমন সব বক্তব্য দিচ্ছেন। ... ১৪ ডিসেম্বর দলের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল মুক্তিযুদ্ধের সময় বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য জামায়াতের দায় অস্বীকার করে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দায়ী করে বক্তব্য দিয়েছিলেন। পরের দিন আরেক আলোচনা সভায় নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে বসেন তিনি।'

'৭১-এর জামায়াতের 'মুক্তিযুদ্ধ' ছিল পাকিস্তান রক্ষার জন্য, জল্লাদ পাকি জেনারেল টিক্কা, নিয়াজী, ফরমান আলীদের বাঁচাবার জন্য এবং নির্বিচারে বাঙালি নিধনের জন্য।

'৭১-এ জামায়াত কীভাবে এবং কেন 'রাজাকার' ও 'আলবদর' বাহিনী গঠন করেছিল এবং এই দুই বাহিনীর সদস্যরা কীভাবে 'দুস্কৃতকারী', 'ইসলামের দুষমন' ও 'ভারতের চর' আখ্যা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে তার বহু বিবরণ তখনকার দৈনিক 'সংগ্রাম ও অন্যান্য দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। রাজাকারদের সম্পর্কে জামায়াতের আমীর গোলাম আযম তখন বলেছিলেন, 'পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্যই জামায়াতে ইসলামী শান্তি কমিটি এবং রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ...জামায়াতের কর্মীরা শাহাদত বরণ করে পাকিস্তানের দুষমনদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা মরতে রাজী, তবুও পাকিস্তানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে রাজী নয়।' (দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

এবারের বিজয়ের মাসে ভীমরতিগ্রস্ত জামায়াত নেতা গোলাম আযম 'একুশে টেলিভিশন'কে বলেছেন, আওয়ামী লীগ নাকি ২০০৮-এর নির্বাচনের আগে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলেনি। এ ধরনের মিথ্যা জামায়াত নেতারা ছাড়া আর কারও পক্ষে উচ্চারণও সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময় ৭৩টি ট্রাইবুনালে যে সব যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও শাস্তি হয়েছিল তাদের অনেকেই ছিল জামায়াতের নেতা-কর্মী। গোলাম আযমরা পাকিস্তানে পালিয়ে না গেলে তাদের বিচার ও শাস্তি তখনই হতো। সেই বিচারের কথা যদি বাদও দিই, ১৯৯২ সালের জানুয়ারি থেকে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে যে আন্দোলন করছি, ৯২-এর ২৬ মার্চ গণআদালতে যুদ্ধাপরাধের দায়ে গোলাম আযমের যে প্রতীকী বিচার করেছি তার সঙ্গে আওয়ামী লীগ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। ১৯৯২-এর ১৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধের দায়ে গোলাম আযমের বিচার দাবি করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা পরদিন সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, জাতীয় সংসদের ধারাবিবরণীতেও লিপিবদ্ধ আছে। ২০০৮-এর আগে আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলেনি এমন নির্লজ্জ মিথ্যা শুধু নাৎসি গোয়েবলস শিষ্য গোলাম আযমরাই বলতে পারেন।

গোলাম আযম ও আজহারুল ইসলামসহ জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা না হলে তাদের ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যকে প্রশ্রয় দেয়া হবে। শুধু ব্যক্তি নয়, '৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের জন্য জামায়াতের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করতে হবে। একই সঙ্গে ইউরোপের মতো যারা যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে কথা বলবে তাদের শাস্তিবিধান করে আইন প্রণয়নও জরুরি হয়ে পড়েছে।

১৮ ডিসেম্বর ২০১০

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঃ অব্যাহত ষড়যন্ত্র

'৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামের ঘাতকরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ইসলাম রক্ষার দোহাই দিয়ে তিরিশ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করেছে। সরকারি হিসেবে দুই লক্ষ, বেসরকারি হিসেবে চার লক্ষের অধিক নারীকে তারা ধর্ষণ করেছে। শত শত জনপদ ভস্মিভূত করেছে। এর পাশাপাশি চলেছে বেপরোয়া লুণ্ঠন ও নির্যাতন সহ মানবতাবিরোধী যাবতীয় অপরাধ। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের এক কোটি মানুষ সসর্বস্ব হারিয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রতিবেশী ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। স্বদেশে উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করেছেন আরো কয়েক কোটি মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত নৃশংস ও ব্যাপক গণহত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা বিশ্বের অন্য কোনও দেশে ঘটেনি।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর সমগ্র বাঙালি জাতি আশা করেছিল যারা যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী, যারা '৭১-এর নয় মাসে গণহত্যা ও নারীনির্যাতন সহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করেছে তাদের বিচার হবে। সেই সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষদের সহানুভূতি জানাবার জন্য বহির্বিশ্ব থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও বিশেষ ট্রাইবুনালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলেছেন। বিশ্ব শান্তি পরিষদ প্রতিনিধি দলের নেত্রী মাদাম ইসাবেলা ব্লুম ২০/১/৭২ তারিখে ঢাকায় সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমিতে বাঙ্গালী হত্যাযজ্ঞের যে রোমহর্ষক নৃশংসতার স্বাক্ষর আমি দেখেছি তাতে আমি শোকাভিভূত ও সন্ত্রস্ত হয়ে গেছি। এই হত্যাকাণ্ড নাৎসী গ্যাস চেম্বারের হত্যাযজ্ঞের চেয়েও অনেক বিভৎস'। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে পরিষদের সভাপতির কাছ এই গণহত্যার জন্য আন্ত র্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাবেন বলে জানান। (আজাদ, ২২/১/৭২)

স্বাধীনতাযুদ্ধের সমর্থক মার্কিন সিনেটের ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য এ্যাডলাই স্টিভেনসন কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের বধ্যভূমিগুলো দেখে এসে ৩০ জানুয়ারি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংসতা ছিল ভয়াবহ এবং মানবজাতির ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। এই বর্বরতা মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে।' (আজাদ, ৩১/১/৭২) মার্কিন সিনেটের অপর সদস্য এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন, 'মানুষের মস্তিষ্কে এ'ধরনের বর্বরতার চিন্তা আসতে পারে এ'কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।' (আজাদ, ১৭/২/৭২)

ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরো বলেছিলেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসীদের নৃশংসতার নিদর্শন আমি দেখেছি, কিন্তু এখানকার নৃশংসতা তার চেয়ে অনেক বেশি।' (আজাদ, ১৩/৩/৭২)

১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠকে গণহত্যা তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া

হয়। হাইকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারপতি বা সমপর্যায়ের কোন মনোনীত ব্যক্তির নেতৃত্বে কমিশন পাকবাহিনী ও তাদের দালালদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের মৌখিক ও লিখিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ব্যাপক রিপোর্ট পেশ করবেন বলে ঘোষণা করা হয়।

১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওই দিন রমনা রেসকোর্স ময়দানে তিনি বলেন, 'বিশ্বকে মানবেতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক দল এই বর্বরতার তদন্ত করুক এই আমার কামনা।' (দৈনিক বাংলা, ১১/১/৭২) ১০ জানুয়ারির জনসভাতে তিনি আরও বলেন 'যারা দালালী করেছে, আমার শত শত দেশবাসীকে হত্যা করেছে, মা বোনকে বেইজ্জতি করছে, তাদের কি করে ক্ষমা করা যায়? তাদের কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করা হবে না, বিচার করে তাদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে।'

৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দশ লক্ষ লোকের বৃহত্তম জন সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, যারা গণহত্যা চালিয়েছে তারা সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, এদের ক্ষমা করলে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না।' (দৈনিক বাংলা, ২৩/২/৭২)

২৬ এপ্রিল তিনি দিল্লী স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যারা গণহত্যা করেছে তাদের এর পরিণতি থেকে রেহাই দেয়া যায় না। এরা আমার ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করেছে। এদের ক্ষমা করলে ভবিষ্যত বংশধরগণ এবং বিশ্বসমাজ আমাদের ক্ষমা করবেন না।' (দৈনিক বাংলা, ৩০/৪/৭২)

বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২৪ জানুয়ারি '৭২ তারিখে প্রথমে দালাল আইন (বাংলাদেশ দালাল বিশেষ ট্রাইবুনাল অধ্যাদেশ ১৯৭২) জারি করা হয়েছিল। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য '৭৩ সালে সংবিধান সংশোধন করে একটি ধারা [৪৭(৩)] সংযোজন করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছে — 'এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।' বাংলাদেশের সংবিধানের এই প্রথম সংশোধনীর সঙ্গে আরও দুটি ধারার [৪৭ক।(১), (২)] মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের জন্য সংবধিানে বর্ণিত কতিপয় মৌলিক অধিকারও রহিত করা হয়েছে।

প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩-এর ২০ জুলাই জাতীয় সংসদে 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইবুনালস) অ্যাক্ট ১৯৭৩' পাস করেছিলেন। এর আগে পৃথিবীর কোনও দেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানসম্মত নিজস্ব আইন প্রণয়ন করতে পারেনি।

১৯৭৩ সালের ১৭ মে দালাল আইনে গ্রেফতাকৃত ব্যক্তিদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। তবে এতদসংক্রান্ত সরকারী প্রেস নোটে এটাও বলা হয় যে— ধর্ষণ, খুন, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজ অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অপরাধের দায়ে 'দণ্ডিত ও অভিযুক্ত' ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শন প্রযোজ্য হবে না। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজার ব্যক্তির ভেতর প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পেয়েছিল। তারপরও প্রায় ১১ হাজার ব্যক্তি এ সকল অপরাধের দায়ে কারাগারে আটক ছিল, অনেকে সাজা ভুগছিল। ১৯৭৫-এর ৩১ ডিসেম্বর বিচারপতি সায়েম ও জেনারেল জিয়ার সামরিক সরকার দালাল আইন বাতিল করে। যার ফলে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধী জেল থেকে বেরিয়ে আসে।

'৭৬-এ রাজনৈতিক দলবিধি জারি করে জেনারেল জিয়া যুদ্ধাপরাধী ও মৌলবাদীদের দল জামায়াতে ইসলামী ও সমচরিত্রের অন্যান্য দলকে রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ প্রদান করেন যা '৭২ সংবিধানের নিষিদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের ৩৮ ধারায় বলা হয়েছিল, '.... রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।' জেনারেল জিয়া ১৯৭৮ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ অবলুপ্ত করার পাশাপাশি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক দলগঠনের উপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন, যে দলগুলো '৭১-এ গণহত্যা ও নারীনির্যাতন সহ যাবতীয় যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী।

'৭১-এর ঘাতক-দালালদের বিচারের দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং সচেতন নাগরিক সমাজের সংঘবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি থেকে, যখন শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১০১ জন বিশিষ্ট নাগরিকের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তাদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে আরম্ভ হয় এক অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলন। আওয়ামী লীগ সহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পেশাজীবী সংগঠন এই আন্দোলনের শরিক ছিল। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২৫ মার্চ ২০10 তারিখে '৭১-এর গণহত্যাকারী, মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য '৭৩-এর আইনে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করেছে এবং যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতের চার জন শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়— নয় মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে অথচ সরকার গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগনামা প্রণয়ন করতে পারেনি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে এই বিলম্বে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ পারিবারের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষ ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে পড়ছেন। শুরু থেকেই ট্রাইবুনালে দক্ষ

আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তার অভাব আমরা লক্ষ্য করেছি। ট্রাইবুনাল গঠনের আগেও বলেছি দশ/বার জন শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীর বিচার যদি আগামী নির্বাচনের আগে আমরা সম্পন্ন করতে চাই এর জন্য অন্ততপক্ষে পঁচিশ জন আইনজীবী ও সমসংখ্যক তদন্ত কর্মকর্তা প্রয়োজন— যাদের সততা, দক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি অঙ্গীকার হবে প্রশ্নাতীত। এ ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের লোকবল এক তৃতীয়াংশেরও কম।

পুরনো হাইকোর্ট ভবনের মাত্র পাঁচটি কামরা ট্রাইবুনালকে বরাদ্দ করা হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। আমরা পুরো হাইকোর্ট ভবন ট্রাইবুনালের জন্য বরাদ্দ করতে বলেছি, কেন করা হচ্ছে না সরকারের নীতিনির্ধারকরাই তা বলতে পারবেন। আর্থিকভাবেও ট্রাইবুনাল স্বাধীন ও স্বাবলম্বী নয়। বিচার আরম্ভ হলে জাতিসঘ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা আসবেন বিচারের মান ও স্বচ্ছতা প্রত্যক্ষ করার জন্য। ট্রাইবুনালের বর্তমান দুর্বল কাঠামো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিচার নিশ্চিত করতে পারবে বলে মনে হয় না।

এর পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগীরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের জন্য বহুমাত্রিক তৎপরতা আরম্ভ করেছে। তারা '৭৩-এর আইন, বিচারের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিহীন প্রশ্ন তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের হুমকি দিচ্ছে তারা যেন ট্রাইবুনালে সাক্ষ্য দিতে না যায়। ধারাবাহিকভাবে তারা যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ নষ্ট করছে। সম্প্রতি তারা বিচার বানচালের জন্য বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার উৎখাতের হুমকি দিচ্ছে। জঙ্গী মৌলবাদীদের তারা সংগঠিত করছে শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, মুক্তিচিন্তার বুদ্ধিজীবী এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িতদের হত্যা সহ বিভিন্ন ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য।

বিচারের ক্ষেত্রে বিলম্ব যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের সহযোগীদের উৎফুল্ল করছে, বিচার বিঘ্নিতকরণের চক্রান্ত ক্রমশঃ দেশে ও বিদেশে বিস্তৃত হচ্ছে। মহাজোট সরকারের প্রায় দু বছরের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি— যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ধরন, পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের নীতিনির্ধারকদের ধারণা ও অবস্থান স্বচ্ছ নয়। প্রতিপক্ষের বিচার বানচালের ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও সরকার যথেষ্ট সজাগ নয়। বর্তমান মহাজোট সরকার যদি যথাযথভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে না পারে ভবিষ্যতে অন্য কারো পক্ষেই এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। আমরা আশা করব তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সভ্যতার বোধ সংরক্ষণের জন্য সরকার অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করবে।

১৩ ডিসেম্বর ২০১০

'৭১-এর গণহত্যার বিচার, '৭২-এর সংবিধান এবং আগস্ট ট্র্যাজেডি ঃ সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয়

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট এবং ২০০৪-এর ২১ আগস্ট বাংলাদেশে অত্যন্ত বর্বরোচিত দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট হত্যা করা হয়েছে স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই পুত্রবধূ ও অনুজ সহ পরিবারের ১৬ জন সদস্যকে। ২০০৪-এর ২১ আগস্ট ঘাতকরা হত্যা করতে চেয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বকে। গুরুতর আহত হয়ে শেখ হাসিনা, আবদুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও মোহাম্মদ হানিফ প্রমুখ তিন শতাধিক নেতাকর্মী সেদিন প্রাণে বাঁচলেও নিহত হয়েছেন কেন্দ্রীয় নেত্রী আইভি রহমান সহ দলের ২৪ জন নেতা-কর্মী-সমর্থক। ১৫ আগস্টের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে রাতের অন্ধকারে, ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটেছে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় প্রকাশ্য দিবালোকে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের ভয়ঙ্কর এই দুই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য এবং '৭১-এর নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ঘাতকরা হত্যা করেছিল ৩০ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে। সরকারি হিসেবে দুই লক্ষ, বেসরকারি হিসেবে সোয়া চার লক্ষ নারী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক পশুদের চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এক কোটি মানুষ বাধ্য হয়েছিলেন মাতৃভূমি ত্যাগ করে প্রতিবেশী ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে। '৭১-এর নজিরবিহীন গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের প্রধান প্রণোদনা ছিল পাকিস্তান ও ইসলামকে রক্ষা করা। শুধু পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সহযোগিতা নয়, জামায়াত ও তাদের দোসররা নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিভিন্ন ঘাতক বাহিনী গঠন করেছিল তাদের বিবেচনায় 'আল্লাহর ঘর পাকিস্তান'কে রক্ষার জন্য। জামায়াতের বর্তমান আমীর মতিউর রহমান নিজামী বলেছিলেন, পাকিস্তান হচ্ছে আল্লাহর ঘর— আল্লাহর ঘরকে রক্ষার জন্য জেহাদ করতে হবে, পাকিস্তান ও ইসলামের শত্রুদের নির্মূল করিতে হবে। '৭১-এ জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী বাঙালিদের বিবেচনা করত ইসলামের দুষমন, কাফের, দুষ্কৃতকারী ও ভারতের দালাল। জামায়াতিদের বিবেচনায় গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, জেনেভা সনদ ও জাতিসংঘের এতদসংক্রান্ত যাবতীয় ঘোষণা লংঘন— সব কিছু ইসলামের নামে জায়েজ। জামায়াতের এই ইসলাম হচ্ছে রাজনৈতিক ইসলাম, মওদুদী, হাসান বান্নার ইসলাম,

সৌদি ওয়াহাবি ইসলাম; যার সঙ্গে কোরাণ ও হাদিসে বর্ণিত সুফি-সাধক-পীর-আউলিয়াদের প্রচারিত ইসলামের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

ইসলাম সহ সকল ধর্মের অনুসারীদের ভেতর উদারনৈতিক মানবতাবাদীরা যেমন আছে তেমনি আছে ধর্মান্ধ, ধর্মব্যবসায়ী, মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি। এই অপশক্তি সব সময় পার্থিব লোভ-লালসা-ক্ষমতার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে এবং ধর্ম সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা, বিধান ও নির্দেশ স্বধর্মী-বিধর্মী নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে মানতে বাধ্য করেছে। কোরাণে যদিও সুস্পষ্টভাবে বলা আছে ধর্মের নামে জবরদস্তি চলবে না, যে সব জাতি ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি করেছে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন— তারপরও জামায়াতে ইসলামী এবং সমগোত্রীয় অপরাপর মৌলবাদীরা তাদের বর্ণিত রাজনৈতিক ইসলাম কায়েমের জন্য হত্যা, নির্যাতন, সন্ত্রাস সব কিছু জায়েজ শুধু নয় ওয়াজিব বলে গণ্য করে। '৭১-এর সংঘটিত নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞ সহ মানবতার বিরুদ্ধে যাবতীয় অপরাধের আদর্শিক প্রণোদনা বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই মওদুদীবাদ ও ওয়াহাবিবাদ জানতে হবে।

শুধু '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে নয়, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর থেকে এ দেশের মানুষের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম— সব কিছু পাকিস্তানের শাসকরা দমন করতে চেয়েছে ইসলামের দোহাই দিয়ে। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে জামায়াতিরা শত শত নিরীহ আহমদীয়া মুসলমানদের হত্যা করেছে ইসলামের দোহাই দিয়ে। পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হকের জমানায় এবং বাংলাদেশে খালেদা-নিজামীদের জমানায় যে সব মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের অভ্যুদয় ঘটেছে, যারা নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, সন্ত্রাস ও যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তাদের আদর্শিক প্রেরণা সৌদি আরবের আবদাল ইবনে ওয়াহাব, মিশরের হাসান আল বান্না ও ভারতের আবুল আলা মওদুদীর জঙ্গী জেহাদি ইসলাম, যে ইসলামের সঙ্গে সুফী-সাধকদের দ্বারা প্রচারিত বাংলাদেশের লোকায়ত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

দুই

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক পাঞ্জাবি শাসক-শোষক চক্র বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক শোষণের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। ২৩ বছরের সীমাহীন শোষণে পশ্চিম পাকিস্তানের উষর মরুভূমি হয়েছে শস্য শ্যামল এবং সোনার বাংলা পরিণত হয়েছিল শ্মশানে। সোনার বাংলা শ্মশান কেন এই প্রশ্নের উত্তর বাঙালি খুঁজে পেয়েছে মধ্য ষাটে আওয়ামী লীগের ছয় দফায়। বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছে সত্তরের নির্বাচনে। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সকল হিসাব ও চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিল।

সত্তরের নির্বাচনের আগেই আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতাকে দলের অন্যতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ষাটের দশকে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে বামপন্থীদের ব্যাপক প্রভাব সমাজতন্ত্রের ধারণা জনপ্রিয় করেছে। পাকিস্তানকেন্দ্রিক বাইশ পরিবারের নির্মম শোষণ থেকেই সাধারণ বাঙালির চেতনায় শোষণহীন সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন বিকশিত হয়েছে।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা, বাঙালি জাতিসত্তার বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং বাংলাদেশে গণহত্যার প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে যখন বঙ্গবন্ধু '৭১-এর ৭ মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণে ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবার আহ্বান জানান। ৭ মার্চের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব।' তারপরই বলেছিলেন— 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই একটি আহ্বান সমগ্র জাতির চেতনায় স্বাধীনতা ও শোষণ-পীড়ন মুক্তির যে বোধ সঞ্চারিত করে তা মূর্ত হয়েছে পরবর্তী নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে, যা ছিল সার্বিক অর্থে একটি গণযুদ্ধ।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই নিয়েছিলেন এবং সমগ্র বাঙালিকে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। জন্মের পর থেকেই পাকিস্তান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসিত হয়েছে উর্দিপরা জেনারেলদের দ্বারা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বার বার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। যে কারণে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা এদেশের মানুষের মনে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। '৭০-এর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়ী হওয়ার পরও যখন পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি তখন এটা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল— পাকিস্তানে কখনও গণতন্ত্র সম্ভব নয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান নির্বিশেষে সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এই জাতীয়তাবাদকে অবলম্বন করে একজোট হয়েছে। এভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ নতুন মাত্রায় বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছে। সমাজতন্ত্রের চেতনা এসেছে শোষণমুক্তির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা থেকে। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক প্রেরণা হিসেবে যে সব মূল্যবোধ ও স্বপ্ন যুদ্ধরত বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করেছে '৭২-এর সংবিধানে তা মূর্ত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত রাখবার জন্য নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, নির্যাতন ও জনপদ ধ্বংসসহ যাবতীয় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তাদের এই নৃশংসতার প্রধান দোসর ছিল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম নামক উগ্র মৌলবাদী ও ধর্মব্যবসায়ীদের দল। ইসলামের দোহাই দিয়ে এই সব দল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে যেভাবে গণহত্যা ও নারীনির্যাতনসহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞে প্ররোচিত করেছে— একইভাবে নিজেরাও উদ্যোগী হয়ে গঠন করেছে রাজাকার আলবদর,

আলশামস প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী। এই সব ঘাতক দলের নেতা গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বাঙালিদের হত্যা করতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং দলের কর্মীদের প্ররোচিত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সেই সময় প্রকাশিত জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম'-এর প্রতিদিনের পাতায়। জামায়াতের তৎকালীন আমীর গোলাম আযম পাকিস্তানকে ইসলামের সমার্থক বানিয়ে বলেছিলেন, পাকিস্তান না থাকলে দুনিয়ার বুকে ইসলামের নাম-নিশানা থাকবে না।

বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমান যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, মিলাদ পড়েন, পীর আউলিয়ার দরগায় যান, তারা জামায়াতের গণহত্যা ও নারীনির্যাতনের রাজনৈতিক ইসলাম ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। রণক্ষেত্রে বহু মুক্তিযোদ্ধা 'জয় বাংলা' ও 'জয় বঙ্গবন্ধু' রণধ্বনির সঙ্গে 'আল্লাহু আকবর'ও বলেছেন। কিন্তু তারাও ইয়াহিয়া-গোলাম আযমদের ইসলামের নামে আহাজারির প্রতি কর্ণপাত করেননি। পাকিস্তানের ৯০ হাজারেরও বেশি নৃশংস সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়েও জামায়াতীরা তাদের প্রাণপ্রিয় পাকিস্তান রক্ষা করতে পারে নি। পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা তালিকা তৈরি করে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের হত্যা করেছে। '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগেই জামায়াতের শীর্ষ নেতারা— যারা সুযোগ পেয়েছিলেন পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন অন্যরা দেশের ভেতর আত্মগোপন করেছিলেন। এভাবেই বাংলাদেশে ধর্মব্যবসায়ী জামায়াতীদের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছিল।

'৭২-এর ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে স্বদেশে ফিরে আসেন। বাংলাদেশে ফেরার পথে দিল্লীতে যাত্রাবিরতিকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার জন্য এক বিশাল গণসংবর্ধনার আয়োজন করেন। এই সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু এবং ইন্দিরা গান্ধী— দুজনের ভাষণই ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সংক্ষিপ্ত এক ভাষণে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মহান বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন— আমি আপনাদের তিনটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমার প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল বাংলাদেশের শরণার্থীদের আমি সসম্মানে তাদের দেশে ফেরত পাঠাব। আমার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে আমি সবরকম সহযোগিতা করব। আমার তৃতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল শেখ মুজিবকে আমি পাকিস্তানের কারাগার থেকে বের করে আনব। আমি আমার তিনটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। শেখ মুজিব তাঁর দেশের জনগণকে একটিই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— তিনি তাদের স্বাধীনতা এনে দেবেন। তিনি তাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।

এর জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাকে বলা হয়েছে ভারতের সঙ্গে আপনার কীসের এত মিল? আমি বলেছি ভারতের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে নীতির মিল। আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায়। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও তাই

বিশ্বাস করেন। আমাদের এই মিল হচ্ছে আদর্শের মিল, বিশ্বশান্তির জন্য... । বঙ্গবন্ধু একই দিনে দেশে ফিরে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে রমনার বিশাল জনসমুদ্রে আবারও বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।'

১৯৭২-এর ১১ এপ্রিল গণপরিষদের প্রস্তাবক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল গণপরিষদ, যাদের দায়িত্ব ছিল সংবিধান প্রণয়ন। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, তৎকালীন আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য মন্ত্রী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ছিলেন। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর ন্যাপ) থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তও খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় '৭২-এর ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসের প্রথম বার্ষিকীর দিন। ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর ৪ নবেম্বর তা গৃহীত হয়। ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদের সদস্যবৃন্দ এই সংবিধানে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

'৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রের চার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে। এই সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মুসলমানপ্রধান দেশসমূহের ভেতর প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান গ্রহণ করেছে তুরস্ক ১৯৩৭ সালে। এর আগে ১৯২৮ সালে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের সংবিধান থেকে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' খারিজ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তুরস্কের সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। যে কারণে রাষ্ট্র ও সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তুরস্কে এখন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের মত একটি অনগ্রসর মুসলমানপ্রধান দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে ছিল একটি যুগান্ত কারী পদক্ষেপ।

'৭২-এর সংবিধান যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের সামনে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, তুরস্ক ও ভারতের সংবিধান। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধানসমূহ তাঁরা অধ্যয়ন করেছেন। তাঁরা পর্যালোচনা করেছেন এই সব সংবিধানের সবলতা ও দুর্বলতা। লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জন্য শ্রেষ্ঠতম সংবিধানটি তাঁরা রচনা করবেন। শুধু বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা নয়, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাসহ মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলসমূহের আলোকে আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে 'মৌলিক অধিকার' শীর্ষক অধ্যায়ে ২১টি অনুচ্ছেদ রয়েছে একাধিক উপচ্ছেদসহ।

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে 'রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি' শীর্ষক অধ্যায়ে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যাসহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মালিকানার নীতি, কৃষক শ্রমিকের মুক্তি, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, সুযোগের সমতা, নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, জাতীয় সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন বিষয়ক বিধিমালায় একটি প্রগতি ও শান্তিকামী আধুনিক রাষ্ট্রের যাবতীয় অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে।

'৭২-এর ৪ নবেম্বর গণপরিষদে গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই সংবিধান যে সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় সংবিধানের ভেতর অনন্য স্থান অধিকার করে আছে এ কথা পশ্চিমের সংবিধান বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেছন। বিশ্বের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানের জনক হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ১৭৮৭ সালে। মানবাধিকার শব্দটিরও জন্মদাতা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রের একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ 'সেন্টার ফর ইনক্যয়ারি'র পরিচালক ডঃ অস্টিন ডেসি ২০০৬ সালে ঢাকায় নির্মূল কমিটির এক সেমিনারে বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষাকবচ হিসেবে বাংলাদেশের '৭২-এর সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও নেই। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় মৌলবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে।'

শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষাকবচ হিসেবে ধর্মের নামে রাজনীতি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে বাংলাদেশের আগে অন্য কোন দেশ নিষিদ্ধ করতে পারেনি। এমনকি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিবেশী ভারতের সংবিধানেও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ মুছে ফেলার পাশাপাশি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে আলোকাভিসারী একটি জাতিকে মধ্যযুগীয় তামসিকতার কৃষ্ণগহ্বরে নিক্ষেপ করেছেন। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত '৭২-এর মহান সংবিধানের উপর এই নিষ্ঠুর বলাৎকার বাংলাদেশে পাকিস্তানি ধারার সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। আত্মগোপনকারী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জামায়াতীরা আবার মাথাচাড়া দেয়ার সুযোগ পেয়েছে।

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার বিএনপি এবং তাদের প্রধান দোসর '৭১-এর ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামী ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রচলন করতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা ও ইসলামবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ধর্মব্যবসায়ীদের এই মিথ্যাপ্রচারণা তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে, কারণ স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চিহ্নিত শত্রুরাই

অধিককাল ক্ষমতায় ছিল। ক্ষমতায় থাকাকালীন তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জঘণ্যভাবে বিকৃত করেছে। সর্বক্ষেত্রে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। খালেদা-নিজামীরা এবং তাদের তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীরা অহরহ বলেন, '৭২-এর সংবিধান রচিত হয়েছে ভারতের সংবিধানের মডেলে, ধর্মনিরপেক্ষতা নেয়া হয়েছে ভারতের সংবিধান থেকে। এই সব জ্ঞানপাপীরা জানেন না যে, ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র সংযুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হওয়ার চার বছর পর ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে।

বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন করার সময় বঙ্গবন্ধু এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বহুবার বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালন ও প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। শুধু রাষ্ট্র ও রাজনীতি ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে, কোন বিশেষ ধর্মকে প্রশ্রয় দেবে না।

সেই সময় অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের বক্তব্য ছিল সেক্যুলারিজমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— 'ইহজাগতিকতা'। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা যথেষ্ট নয়। সব ধর্মের প্রতি সমান আচরণ প্রদর্শন করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কোরাণ, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ, ওআইসির সদস্যপদ গ্রহণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার শিক্ষানীতি প্রণয়নে ব্যর্থতারও অনেক সমলোচনা তখন হয়েছে। পশ্চিমে সেক্যুলারিজম যে অর্থে ইহজাগতিক— বঙ্গবন্ধুর সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সেরকম ছিল না। তাঁর সেক্যুলারিজম ছিল তুলনামূলক নমনীয়, কারণ তিনি মনে করেছেন ধর্মের প্রতি রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপীয়দের মনোভাব এবং বাংলাদেশসহ অধিকাংশ এশীয় দেশের সাধারণ মানুষের মনোভাব এক রকম নয়।

ইউরোপে যারা নিজেদের সেক্যুলার বলে দাবি করে তারা ঈশ্বর-ভূত-পরলোক কিংবা কোন সংস্কারে বিশ্বাস করে না। বঙ্গবন্ধু কখনও সে ধরনের সেক্যুলারিজম প্রচার করতে চাননি বাংলাদেশে। ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর কারণে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ও অনীহ বটে, কিন্তু একই সঙ্গে এদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপরায়ণ। শুধু ঈশ্বর ও পরকাল নয়, পীর-ফকিরের কেরামতি ও পানিপড়াসহ বহু কুসংস্কার মানে এদেশের অনেক মানুষ। এ কারণেই বঙ্গবন্ধুকে বলতে হয়েছে— ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের বদৌলতে ধর্ম কীভাবে গণহত্যা ও ধর্ষণসহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞের সমার্থক হতে পারে। যে কারণে '৭২-এর সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি কারও মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। এভাবেই অনন্য হয়ে উঠেছিল '৭২-এর সংবিধান।

মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ বহুবার বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। মুজিবনগর থেকে যে সব

পোস্টার বা ইশতেহার যুদ্ধের সময় বিলি করা হয়েছে সেখানেও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি অবিস্মরণীয় পোস্টারের লেখা ছিল, 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খৃস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান— আমরা সবাই বাঙালী।' ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অস্বীকার করা, মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা, ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানকে অস্বীকার করা এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশকে অস্বীকার করা।

তিন

জেনারেল জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিচার থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করে বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাসের কমকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর তিনি বন্ধ করেছেন '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বাংলাদেশে স্মরণকালের ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করেছে তাদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। '৭২-এর ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দুই সপ্তাহের ভেতর ২৪ জানুয়ারি (১৯৭২) দালাল আইন প্রণয়ন করে তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদেশীয় সহযোগীদের বিচার আরম্ভ করেছিলেন। এই বিচারের জন্য সারা দেশে ৭৩টি ট্রাইবুনাল স্থাপন করা হয়েছিল এবং তাঁর জীবদ্দশায় ৭৫২ জন যুদ্ধাপরাধীকে এই সব ট্রাইবুনালে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে সামরিক ফরমান জারি করে দালাল আইন বাতিল করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধের পাশাপাশি বিচারাধীন ও দণ্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীদের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেন। এরপর তিনি সংবিধানের ৫ম সংশোধনী জারির মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির 'পাকিস্তানিকরণ' ও 'ইসলামিকরণ' প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় জিয়ার উত্তরসুরী আরেক জেনারেল এরশাদ সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধে চেতনায় ভাস্বর '৭২-এর সংবিধানের সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এদেশের দুই কোটি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও আদিবাসীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেন।

অবৈধভাবে ক্ষমতাদখলকারী শত শত মুক্তিযোদ্ধা হত্যার দায়ে অভিযুক্ত দুই জেনারেল জিয়া ও এরশাদ '৭২-এর সংবিধানের উপরে 'বিসমিল্লাহ...' সংযোজন করেছেন, ভেতরে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ-র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস...' এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংযোজন করেছেন এবং '৭২-এর সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করেছেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতলবে, এর সঙ্গে ইসলামপ্রীতি কিংবা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন তাগিদ ছিল না। বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মত মোল্লা-মিলিটারি শাসিত একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করে '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাকিস্তান-সৌদি অক্ষশক্তির নির্দেশে তারা এই দুষ্কর্ম

করেছিলেন। পাকিস্তান ভেঙে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে পাকিস্তান এবং তার আন্তর্জাতিক মুরুব্বিরা কখনও চায়নি সেই দেশটি একটি মর্যাদাশীল আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর '৭২-এর সংবিধান বাংলাদেশকে সেই সুযোগ করে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করলে বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানো যাবে না, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করা যাবে না, জামায়াতিদের মওদুদিবাদী-ওয়াহাবি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না— এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীদের কোন সংশয় ছিল না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেই ৭৫-এর ১৫ আগস্টের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

একইভাবে সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনী বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। '৭২-এর সংবিধানে বর্ণিত ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকলে এদেশে কখনও ইসলামের নামে শতাধিক জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের জন্ম হত না। এই জঙ্গীরা জামায়াতের রাজনৈতিক ইসলামের ঔরসজাত, হাসান আল বান্না, সৈয়দ কুতুব ও আবুল আলা মওদুদী নির্দেশিত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত রাজনৈতিক নেতাকর্মী, নিরীহ অমুসলিম নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী ও ভিন্নমতাবলম্বী সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং সাধারণ মানুষ হত্যা করেছে। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির কাঁধে সওয়ার হয়ে জামায়াত যখন ক্ষমতার শক্তিমান অংশীদার ছিল তখন তাদের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশে যে সব জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের জন্ম হয়েছে তাদের অধিকাংশই আইএসআই ও বিন লাদেনের মদদে পরিচালিত আন্তর্জাতিক জেহাদী বলয়ের অন্তর্গত। গত কয়েক বছরে গ্রেফতারকৃত দেশী-বিদেশী জঙ্গী নেতাদের স্বীকারোক্তি এবং তাদের আস্তানা থেকে উদ্ধারকৃত দলিলপত্র থেকে জামায়াত-জঙ্গী সম্পৃক্তির বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

খালেদা-নিজামীদের জোট সরকারের আমলে সারা দেশে জঙ্গী মৌলবাদীদের শতাধিক গ্রেণেড-বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই সব হামলা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের সমাবেশে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, প্রেক্ষাগৃহে, আদালতে, গির্জায়, আহমদীয়াদের মসজিদে, মন্দিরে এবং সুফীসাধকদের মাজারে। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশের ৬৪টি জেলার ভেতর একটি বাদে ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা হামলা ঘটিয়ে জেহাদীরা জানিয়ে দিয়েছে তাদের নেটওয়ার্ক কতটা শক্তিশালী এবং তারা কী চায়। এই হামলার পর জামাতুল মুজাহিদীনের নামে প্রচারিত বাংলা ও আরবি ভাষায় লিখিত ইশতেহারে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাবার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে তার সঙ্গে মওদুদী-বান্না-বিন ওয়াহাবের রাজনৈতিক দর্শনের কোনও পার্থক্য নেই।

বিএনপি-জামায়াতের জমানায় জঙ্গীরা যতগুলো গ্রেণেড-বোমা হামলা করেছে তার ভেতর সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে ২১ আগস্ট শেখ হাসিনার জনসভায় হামলা। গত কয়েক বছরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে মুফতি হান্নান সহ যে সব জঙ্গী

নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা প্রত্যেকে কবুল করেছে হাওয়া ভবনে বসে তারেক জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় বিএনপি-জামায়াত কীভাবে এর পরিকল্পনা করে জঙ্গীদের দ্বারা কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছে। হরকতুল জেহাদের অন্যতম অধিনায়ক মুফতি হান্নানের বক্তব্য হচ্ছে— জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ১৪ আগস্ট হওয়া ভবনের বৈঠকে স্পষ্টভাবে বলেছেন, শেখ হাসিনাকে হত্যা না করলে বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা যাবে না।

খালেদা-নিজামীদের পাঁচ বছরের রাজত্বকালে জঙ্গী মৌলবাদীরা যতগুলো গ্রেণেড-বোমা হামলা করেছে, যতবার রাজনৈতিক দলের নেতা, বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী সহ নিরীহ মানুষদের হত্যা করা হয়েছে প্রত্যেকবার বলা হয়েছে আওয়ামী লীগ ও ভারত এসব করাচ্ছে, এসব হচ্ছে ইসলামের দুষমনদের কাজ। ঠিক একই কথা বলা হয়েছে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে। ২১ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এর সঙ্গে ভারত ও আওয়ামী লীগকে যুক্ত করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল পার্থ সাহা নামে সদ্য ভারত প্রত্যাগত এক হিন্দু যুবককে এবং নোয়াখালীর এক নগণ্য আওয়ামী লীগ কর্মী জজ মিয়াকে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য গোয়েন্দা বিভাগ থেকে জজ মিয়ার পরিবারকে নিয়মিত মাসোহারা প্রদানের বিষয়টি এখন গোপন নেই। অতি সম্প্রতি গ্রেফতার করা হয়েছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত সচিব ও ভাগ্নে ডিউককে, যে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে কীভাবে সরকারের নির্দেশে ২১ আগস্টের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। ১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘটিত হয়েছিল '৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ।

চার

২০০৮-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট যে অভূতপুর্ব বিজয় অর্জন করেছে তার প্রধান কারণ দুটি। ১) '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে মহাজোটের অঙ্গীকার এবং ২) জঙ্গী মৌলবাদ ও রাজনৈতিক ইসলামের ধ্বজাধারী বিএনপি-জামায়াত জোটের দুঃশাসনের প্রতি মানুষের অপরিসীম ঘৃণা।

সরকার গঠনের পরপরই মহাজোট সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর সরকার কতৃর্ক প্রণীত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন ১৯৭৩' অনুযায়ী গত ২৫ মার্চ (২০১০) বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের নেতৃত্বে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল' গঠন করেছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ সহ অন্যান্য সুযোগ সহযোগিতার অভাবে ট্রাইবুনালের কাজ অত্যন্ত শ্লথগতিতে চললেও এ বিষয়ে সরকারের আন্তরিকতায় আমরা এখনও সন্দেহ পোষণ করিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় অবস্থানের কথা বহুবার ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের

বক্তব্য হচ্ছে— যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও বিচারের ধরন, মান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের ধারণা যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। এই অস্বচ্ছতা ও অপূর্ণতা দূর করা এমন কোন কঠিন কাজও নয়। এ বিষয়ে অভিজ্ঞজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে পর্যাপ্ত লোকবল, অর্থ ও অন্যান্য উপকারণ নিশ্চিত করে ট্রাইবুনালকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ দেয়া হলে এই সরকারের মেয়াদকালের ভেতর অন্ততপক্ষে ১৫-২০ জন শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীর বিচার সম্ভব। আমরা আশা করব ট্রাইবুনাল '৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে শুধু ব্যক্তির নয়, সংগঠনেরও বিচার করবে, যেমনটি করা হয়েছে নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালে। একই সঙ্গে এই সব অপরাধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও ট্রাইবুনাল উন্মোচন করবে মওদুদী-ওয়াহাবি রাজনৈতিক ইসলামের স্বরূপ জানার জন্য।

মহজোট সরকারের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের চেয়ে তাদের জন্য বড় সমস্যা হচ্ছে '৭২-এর সংবিধানের পুনঃপ্রবর্তন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার দিক নির্দেশনা হচ্ছে '৭২-এর সংবিধান।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন বিবেচনা করতেন '৭২-এর সংবিধানকে। এই সংবিধান যেদিন গণপরিষদের অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হয় সেদিন তিনি এক অসাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণে তিনি সংবিধানের চার মূলনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ভাষণে বলেছিলেন — 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবো না। ...মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খৃস্টানরা তাদের ধর্ম করবে তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার— এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিষ। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলবো সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।'

১৯৭২-এর ৪ নবেম্বরের এই ঐতিহাসিক ভাষণটির উপসংহারে বঙ্গবন্ধু বলেছেন— 'জনাব স্পীকার সাহেব, আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের বিপদসমূহের কথা যেসব থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি; কিন্তু

তা সত্ত্বেও আজকে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন, সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে আমার দল যে ওয়াদা করেছিল তার এক অংশ পালন করলো— কিন্তু জনতার শাসনতন্ত্রে কোন কিছু লেখা হয় না। তারা এটা গ্রহণ না করলে প্রবর্তন করা হবে না, ব্যবহার না করলে হবে না। ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ গঠন করতে পারে, তাহলে আমার জীবন সার্থক, শহীদের রক্তদান সার্থক। আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই জনাব স্পীকার সাহেব, আজ বিদায় নেওয়া হচ্ছে, সদস্যরা আবার সই করতে আসবেন। যাঁরা ৫ বছরের জন্য এখানে এসেছিলেন তারা যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিলেন, যে উদারতা দেখালেন তা বিরল। ভবিষ্যতে যাঁরা এখানে আসবেন তাঁরা যেন তা উপলব্ধি করেন।'

'৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তনের জন্য মহাজোট সরকার একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি গঠনের অনেক আগে ২০০৫ সালে বাংলাদেশের হাইকোর্ট জেনারেল জিয়াকৃত সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল করে এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াতের রীট বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট তা বহাল রেখেছে। এই রায়ের ফলে চার মূলনীতি ও প্রস্তাবনা সহ '৭২-এর সংবিধান আইনতঃ কার্যকর হয়ে গেছে। সরকারের দায়িত্ব শুধু রায় মোতাবেক সংবিধানটি নতুনভাবে প্রকাশ করা। ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হলে জেনারেল এরশাদ কর্তৃক জারিকৃত ৮ম সংশোধনীও স্বাভাবিক নিয়মে অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে কেউ উচ্চতর আদালতের শরণাপন্ন হলে সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

দুভার্গ্যের বিষয় হচ্ছে ৫ম সংশোধনী সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়ের পর প্রধানমন্ত্রী মহাজোটের বৈঠকে বলেছেন, সরকার '৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি পুনঃপ্রবর্তন করলেও জেনারেল জিয়া কর্তৃক সংযোজিত 'বিসমিল্লাহ...' সংবিধানে থাকবে, 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর যে নিষেধাজ্ঞা জিয়া বাতিল করে দিয়েছেন তাও থাকবে এবং জেনারেল এরশাদ কর্তৃক জারিকৃত রাষ্ট্রধর্ম ইসলামও থাকবে। '৭২-এর সংবিধান সম্পর্কে সরকারের এই অবস্থান নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, একই সঙ্গে ৩০ লক্ষ শহীদের স্বপ্ন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী।

'৭২-এর সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— 'আমরা বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তালিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।' 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' '৭২-এর সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য ক)

সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, ঘ) কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।' ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, '...রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।'

'৭২-এর সংবিধানের এই সব অনুচ্ছেদ সামরিক শাসক জিয়া বাতিল করে দিয়েছিলেন বাংলাদেশে মওদুদী-বান্না-ইবনে ওয়াহাবের সন্ত্রাসী রাজনৈতিক ইসলাম কায়েমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য; যা সুপ্রিম কোর্ট শুধু বাতিলই করেনি, যারা জনগণের মূল্যবান আমানতের খেয়ানত করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তিরও প্রস্তাব করেছে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর ধর্মের নামে রাজনীতি চালু রাখা নিঃসন্দেহে আদালত অবমাননার শামিল।

সংবিধান বলছে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছি এবং জীবনদান করেছি। সরকার বলছে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকবে। সরকারের এই অবস্থান যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমার্থক হয় তাহলে বলতে হবে জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদকে আমরা এতকাল অন্যায়ভাবে ৫ম ও ৮ম সংশোধনীর জন্য সমালোচনা করেছি। 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' এবং ধর্মভিত্তিক দল চালু রাখতে হলে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়া যে দুষ্কর্ম করেছিলেন সেগুলো বহাল রাখতে হবে। তার আগে সরকারকে সংসদে অধ্যাদেশ জারি করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় বাতিল করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কায়েমের জন্য '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেনি, কিংবা জিয়া ও এরশাদের উগ্র সাম্প্রদায়িক অবৈধ কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার জন্য ২০০৮ সালে জনগণ শেখ হাসিনার মহাজোটকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে সংসদে পাঠায়নি।

পাঁচ

৫ম সংশোধনী বাতিলের রায়ে '৭২-এর সংবিধানের উপরে জিয়া কর্তৃক 'বিসমিল্লাহ...' সংযোজন এবং রাষ্ট্রের মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে যা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উদ্ধৃত হয়েছে সেখানে জিয়ার বেআইনি কাজের উল্লেখ করতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, মানবিক ও আইনি প্রয়োজন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের উদাহরণ সহ উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সহযোগী যাঁরা '৭২-এর সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তাঁরা কী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান পড়েননি? তাঁরা কি ধর্মের নামে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেননি? তারা কি ইসলামের ইতিহাস পড়েননি বা যথেষ্ট ধর্মপরায়ন ছিলেন না? বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বা তাঁর সরকারের নীতিনির্ধারকরা কি এ ধরনের কোন ধারণা পোষণ করেন? তবে কি আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ভুল

করে সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ...' সংযুক্ত করেননি? বিষয়টি মোটেও তা নয়। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সব কিছু বিবেচনা করেই বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে সংবিধানকে সাম্প্রদায়িকতার দায়ে কলঙ্কিত করতে চান নি।

যে কোন ধর্মপরায়ণ মুসলমান কোন কাজ করার আগে 'বিসমিল্লাহ...' বলেন, একইভাবে ধর্মপরায়ণ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানরা ব্রহ্মা, বুদ্ধ, ঈশ্বর বা যীশুকে স্মরণ করতে পারেন। কোনও উল্লেখ না থাকলে সংবিধান পাঠ করার আগে স্বাভাবিকভাবে একজন ধার্মিক মুসলমান যেমন 'বিসমিল্লাহ' বলবেন, হিন্দু বলতে পারেন 'ওঁ তৎসৎ' বা অন্য কিছু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানরা তাঁদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী প্রয়োজন বোধ করলে সৃষ্টিকর্তার নাম নিতে পারেন বা নাও পারেন। কিন্তু যখনই 'বিসমিল্লাহ...' সংযোজন করা হবে তখনই অমুসলিম নাগরিকদের বাধ্য করা হবে ভিন্ন ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে যা গণতন্ত্র বা মানবাধিকার নয়, ইসলামের মহানবীর শিক্ষারও পরিপন্থী।

৬২২ খৃষ্টাব্দে মদিনায় বিশ্বের প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মদিনার বিভিন্ন গোত্রপ্রধানের অনুরোধে তিনি একটি অনন্যসাধারণ সংবিধান রচনা করেন যা মদিনা সনদ বা 'সহিফাত আল মদিনা' নামে পরিচিত। নগর-রাষ্ট্র মদিনায় মুসলমান ছাড়াও ইহুদিদের আটটি গোত্র এবং সনাতনধর্মীরা ছিল। বিভিন্ন ধর্ম, জাতিসত্তা ও গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত এই রাষ্ট্রের জন্য মহানবী যে সংবিধান রচনা করেন চরিত্রগতভাবে তা ধর্মনিরপেক্ষ। এই সংবিধানে সকল ধর্মের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদানের পাশাপাশি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল নির্বিশেষে মদিনার নাগরিকদের একই উম্মা বা জাতির স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে মহানবী বিশ্বের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রে কোরাণকে সংবিধান হিসেবে ঘোষণা করতে পারতেন যেমনটি চায় এখনকার ওয়াহাবিরা। ইচ্ছা করলে তিনি মদিনায় ইসলামকে সরকারি ধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করতে পারতেন। এতে মদিনার অমুসলিম নাগরিকরা অসন্তুষ্ট হলেও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কিন্তু তিনি তা না করে রাষ্ট্রনায়কোচিত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, মানবাধিকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমনকি মদিনার সংবিধানের উপরে 'বিসমিল্লাহ...' সংযোজনের প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি।

রাষ্ট্রীয় দলিল বা চুক্তিতে 'বিসমিল্লাহ...' বা ইসলামের প্রতি পক্ষপাতমূলক কোন বাক্য সংযোজনের যে কোনও প্রয়োজন নেই এটা ইসলামের মহানবীরও শিক্ষা, এ বিষয়ে মওদুদি-বান্না-বিন ওয়াহাবিদের নির্দেশ মানার কোন প্রয়োজন নেই। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে মহানবী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তিতে হযরত আলী প্রথমে 'বিসমিল্লাহ হির রাহমানুর রহিম' লিখেছিলেন। কোরেইশদের দলনেতা চুক্তির অপর স্বাক্ষরকারী সোহেল এতে আপত্তি করেছিলেন। তার আপত্তির কারণে মহানবীর নির্দেশে হযরত আলী 'বিসমিল্লাহ...' কেটে দিয়েছিলেন। এরপর চুক্তিকারী প্রথম পক্ষ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নামের সঙ্গে যখন 'আল্লাহর রসুল' লেখা হল তখনও সোহেল আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন মহানবীকে তারা আল্লাহর রসুল হিসেবে মানেন

না। প্রতিপক্ষের আপত্তির কারণে তাও বাদ দিতে হয়। চুক্তির শুরুতে লেখা হয়— আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদের সঙ্গে আমরুর পুত্র সোহেলের এই মর্মে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে... ।'

সংবিধান বা রাষ্ট্রীয় কোনও দলিল বা চুক্তিতে ধর্মকে অনাবশ্যকভাবে উল্লেখের প্রয়োজন যদি স্বয়ং মহানবী মনে না করেন তাঁর প্রকৃত উম্মতরা কখনও তা করতে পারেন না। আগেই বলেছি বাংলাদেশের রাজনীতির দুই খলনায়ক জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতলবে ইসলামের নামে বৈশ্যবৃত্তি করার জন্য '৭২-এর সংবিধানের ইসলামীকরণ করেছিলেন, যার সঙ্গে ইসলামপ্রীতির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে জামায়াত ও বিএনপি যথারীতি বলেছিল আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে দেশে ইসলাম থাকবে না, যেমনটি বলেছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে— আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধারা ইসলামের দুষমন। বাংলাদেশের মানুষ '৭১-এ ধর্মব্যবসায়ীদের কথায় কর্ণপাত করেনি, ২০০৮ সালের নির্বাচনেও এই অপপ্রচার তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

'৭২-এর সংবিধান সংশোধন ও পুনঃপ্রবর্তনের জন্য সরকার যে সংসদীয় কমিটি গঠন করেছে— উচিৎ হবে তারা যেন '৭২-এর সংবিধান প্রণেতা এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ সহ নাগরিক সমাজ, বিশেষভাবে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এর পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করেন। '৭২-এর আদি সংবিধানের কিছু সংশোধনী সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে। আদিবাসী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অধিকার ও মর্যাদা, তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, জাতির জনকের মর্যাদা, সংবিধানের মূল নীতি প্রভৃতি সংরক্ষণ সহ ইতিপূর্বে কৃত প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলো আদি সংবিধানে থাকা প্রয়োজন। ১৯৩৭ সালে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করলেও তখন এর কোন গ্যারান্টি ক্লয ছিল না। ১৯৮২ সালে তুরস্কে চতুর্থবারের মতো সংবিধানে বড় রকমের সংশোধনী গৃহীত হয় যেখানে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা সহ পূর্বঘোষিত ছয় মূলনীতি সম্পর্কে বলা হয় কোন অবস্থায় এই সব নীতি পরিবর্তন করা যাবে না।

সরকার যদি মনে করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য 'বিসমিল্লাহ...' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' আদি সংবিধানে রাখা উচিৎ— আমাদের পরামর্শ হবে ইসলাম বোঝার জন্য নিজামী-আমিনী-খালেদাদের জঙ্গী ওয়াহাবি ইসলামের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে সংসদীয় কমিটি যেন মহানবী প্রণীত মদিনার সংবিধানটি অধ্যয়ন করে। একটি দেশের সংবিধান গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল সেটা নির্ভর করে সেই সংবিধানে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়, নারী, শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকার ও মর্যাদার নিশ্চয়তা কতটুকু রয়েছে তার উপর।

ইসরাইলের বড় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধানে রাষ্ট্রের পরিচয় ধর্মীয় না ধর্মনিরপেক্ষ হবে ৬১ বছরে তা নির্ধারণ করতে পারেনি। ইসরায়েলের

পার্লামেন্ট ইহুদি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করতে পারছে না প্রধানতঃ পশ্চিম ইউরোপ ও আরব দেশগুলোর চাপের কারণে। প্যালেস্টাইন ও আরব দেশগুলো পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে ইসরাইল ইহুদি রাষ্ট্র হলে সংখ্যালঘু মুসলমান ও খৃষ্টানরা বৈষম্যের শিকার হবে। ইসরাইলকে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার উদ্যোগকে আরব রাষ্ট্ররা 'বর্ণবাদী' আখ্যা দিয়ে বলেছে কোন আধুনিক রাষ্ট্র ধর্মের উপর ভিত্তি করে দাঁড়াতে পারে না, যদিও তারা নিজেদের দেশকে ইসলামের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করে।

বর্তমান বিশ্বের প্রধান প্রবণতা হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-জাতিসত্তানির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করা। বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া সহ অধিকাংশ মুসলমান প্রধান দেশের সংবিধানের মাথায় 'বিসমিল্লাহ...' লেখা নেই এবং সেসব দেশে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের উল্লেখ নেই। সভ্য মানুষ সামনে এগোয়, ভূতের মতো পেছনে হাঁটে না। মহাজোট সরকারের নীতি নির্ধারকদের স্থির করতে হবে তারা একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়বেন না জিয়া এরশাদের মতো জাতিকে মধ্যযুগীয় তামসিকতায় নিক্ষেপ করবেন। প্রধানমন্ত্রী ২০২০-২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছেন। একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কখনও সম্ভব হবে না জঙ্গী ওয়াহাবি রাজনৈতিক ইসলাম যদি রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজের দিক নির্দেশক হয়।

যারা মহাজোট সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছেন জিয়া-এরশাদকৃত '৭২-এর সংবিধানের সাম্প্রদায়িকীকরণ বজায় রাখার জন্য তারা এই দুই জেনারেলের অভিপ্রায় অনুযায়ী বাংলাদেশে মওদুদী-বান্না-ওয়াহাবিবাদ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আওয়ামী লীগকে মুসলিম লীগে রূপান্তরিত করতে চাইছেন। ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে আওয়ামী লীগ অচিরেই আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং অন্তিমে মুসলিম লীগে পরিণত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টিকারী মুসলিম লীগের স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে।

বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক সমাজ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালিত্বের চেতনা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূর্ত প্রতীক '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্রয়োজন হলে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের জন্য আমাদের প্রস্তুত হবে। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সংবিধান মওদুদীবাদী ওয়াহাবি মোল্লাদের কাছে আমরা বিক্রি হতে দেব না।

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আওয়ামী লীগের জন্মদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন যে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেছেন, যে আদর্শ ও সংগ্রাম গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারে— সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ইতিহাস কখনও ক্ষমা করবে না।

৩১ আগস্ট ২০১০

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঃ পর্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধকতা

গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের মতো নৃশংস আন্তর্জাতিক অপরাধ যে দেশেই ঘটুক না কেন স্থান-কাল নির্বিশেষে যে কোন সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ এর বিচার এবং অপরাধীদের শাস্তি কামনা করবেন। যারা এসব অপরাধ করে এবং যারা অপরাধীদের সহযোগিতা করে, শক্তি জোগায়, তারা যৌক্তিক কারণেই বিচারের বিরোধিতা করবে একশ একটা কুযুক্তি ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে।

এদের মিথ্যাচারের প্রধান অভিব্যক্তি দুটি। এক, সংঘটিত গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্তি অস্বীকার করা এবং দুই, এসব অপরাধ সংঘটনকে অস্বীকার করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নাৎসি বাহিনী সমগ্র ইউরোপে ষাট লক্ষ ইহুদি, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের হত্যা করেছিল এই সত্য সর্বজনবিদিত। তবে ইউরোপে এখনও মানসিকভাবে কিছু অসুস্থ ব্যক্তি আছে যারা শয়তানের কাছে বিবেক বন্ধক রেখেছে; তারা বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের হলোকস্টের ঘটনা কাল্পনিক, অর্থাৎ ইউরোপে এ ধরনের কোন গণহত্যা ঘটেনি।

বাংলাদেশে বিএনপির প্রধান মিত্র যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামীও এমত বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে প্রচার করছে— '৭১-এ যুদ্ধাপরাধের কোন ঘটনা ঘটেনি, বাংলাদেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই, জামায়াতের কোন নেতা যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল না ইত্যাদি। জামায়াত প্রাণে বাঁচার জন্য, বিএনপি মিত্রকে রক্ষার জন্য এমন কথা বলবে এটাই প্রত্যাশিত, কিন্তু সরকারের কোন মন্ত্রী যদি বলেন, তিনি জামায়াত নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত, '৭১-এ জামায়াত যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, তারা শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে— আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না জামায়াতের নেটওয়ার্ক কত শক্তিশালী।

মাস দুয়েক আগে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা প্রশাসনে জামায়াতের শক্তিশালী অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনালে 'প্রধান' তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে জামায়াত সমর্থক একজনকে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে সরকারের জন্য বড় বাধা হচ্ছে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তৃত জামায়াত এবং তাদের সহযোগীদের বিষাক্ত শেকড়। এই শেকড়ের দৌরাত্ম্যে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে মহাজোট সরকারের অনেক অঙ্গীকার এবং মুক্তিযুদ্ধের বহু অর্জন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহত্তম অর্জন হচ্ছে '৭২-এর ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক সংবিধান। দুই উর্দিপরা জেনারেল অবৈধভাবে ক্ষমতাদখল করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এই পবিত্র দলিলকে যেভাবে ধর্ষণ করেছেন, তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা '৭১-এ যেভাবে ধর্ষণ করেছে চার লক্ষ

প্রিয়ভাষিণী ও গুরুদাসীদের। এই ধর্ষণকে বৈধতা দেয়ার জন্য '৭২-এর সংবিধান 'হালনাগাদ' করার নামে সম্প্রতি সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির কোন বৈঠক হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তারা সরকার ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করবে না ঈশ্বর জানেন এই কমিটি কী সুপারিশ করবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের আশঙ্কা— ঠুঁটো জগন্নাথের মতো দুর্বল ট্রাইবুনালে তিরিশ লক্ষ শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং '৭১-এর নৃশংসতম গণহত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসের কয়েক কোটি সংক্ষুব্ধ প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী কি ন্যায়বিচার পাবেন?

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য এ বছর ২৫ মার্চ গঠিত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল'। গত চার মাসে একুনে একশ একুশ দিন পেরিয়ে গেছে, এখনও ট্রাইবুনালে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। যে ৭ জন আইনজীবী এ পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই দফতরে আসেন না। ট্রাইবুনালের এক তদন্ত কর্মকর্তা কোন কোন দলিলের ভিত্তিতে কীভাবে তদন্ত করছেন সাংবাদিকদের সেসব তথ্য জানিয়ে দিয়ে প্রশাসনের ভেতরে অবস্থানকারী জামায়াতিদের সংকেত পাঠিয়েছেন এসব দলিল নষ্ট করে ফেলতে হবে। আমাদের মন্ত্রীরা কাদের বিচার কীভাবে কতদিনে হবে এ নিয়ে হরহামেশা টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে এবং সেমিনার-গোলটেবিল বৈঠকে যে সব কথা বলছেন— আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনে হবে ট্রাইবুনাল বুঝি মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি কোন সংস্থা।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়গুলোর ভেতর সমন্বয়হীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীরা বিভিন্ন থানায় ব্যক্তিবিশেষের দায়ের করা '৭১-এর গণহত্যার মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন— এ বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি কিছুই জানতেন না, ট্রাইবুনালের জানার তো প্রশ্নই ওঠে না। আগে যেমনটি হয়েছে— আমাদের বিস্তর চ্যাঁচামেচির কারণে ফৌজদারি আদালতে নিজামী-মুজাহিদ গংদের বিচার বন্ধ হয়েছে বটে তবে ১৯৭৩-এর 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন' অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে কতদিনে এই বিচার সম্পন্ন হবে এ নিয়ে সংশয় ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। সরকারের নীতিনির্ধারকরা যদি বুঝতে পারতেন এই বিচারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যেমন প্রবল আগ্রহ রয়েছে এর মান, পদ্ধতি ও রায় জানার জন্য— একইভাবে পান থেকে এতটুকু চুন খসলে তাদের কেউ ছেড়ে কথা বলবেন না।

বলা যেতে পারে এই বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার পুলসিরাতের উপর দিয়ে হাঁটছেন, সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে, যেখান থেকে উঠে আসার কোন পথ নেই। ট্রাইবুনালের বর্তমান কাঠামো এমনই দুর্বল যে এখন জামায়াত পর্যন্ত উপহাস করার ধৃষ্টতা দেখায়। জামায়াতের এক আইনজীবী বলেছেন এই টাইবুনাল নাকি 'দু চারজন কর্মচারীর দোকান', একই সঙ্গে '৭৩-এর আইনকেও তিনি 'ফালতু' বলেছেন। (কালের কণ্ঠ, ২৫ জুলাই ২০১০) ট্রাইবুনালের

আইনজীবীদের মুরোদে কুলোয়নি আদালত অবমাননার জন্য জামায়াতি দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে মামলা করতে। ট্রাইবুনালের বেহাল অবস্থার কারণেই জামায়াত এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে পারছে। ট্রাইবুনালের হাল হকিকত সম্পর্কে আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং সরকারের করণীয় সম্পর্কে গত ৭ জুলাই আমরা ৭ জন মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি, যার কিছু কার্যকর হলেও অধিকাংশ এখনও পূর্বাবস্থায় রয়েছে।

দেশে ও বিদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিঘ্নিতকরণ চক্রান্তের বেড়াজাল ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং কূটনৈতিক তৎপরতা। গত দেড় বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রি-মহাদেশীয় সম্মেলনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি— সুপরিকল্পিত, সংহত ও সার্বিক কূটনৈতিক তৎপরতা ব্যতিত প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূলে আনা সম্ভব নয়। একইভাবে দেশের ভেতর যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামীর যাবতীয় অন্তর্ঘাতমূলক ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বন্ধ করতে হলে দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার বিকল্প নেই। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ৫ম সংশোধনী বাতিলের ফলে আমরা অনেকখানি ফিরে গেছি আদি সংবিধানে, যেখানে ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। জামায়াত এবং সমচরিত্রের দল নিষিদ্ধ না করার সরল অর্থ হচ্ছে— সুপ্রিম কোর্টের রায় সরকার বা জামায়াত কেউ পরোয়া করে না।

'৭২-এর সংবিধান যুগোপযোগী করার নামে জঙ্গী মৌলবাদীদের গডফাদার জামায়াতের মতো আত্মঘোষিত যুদ্ধাপরাধীদের দলকে যদি রাজনীতি করার লাইসেন্স প্রদান করা হয় সেটা হবে মুক্তিযুদ্ধের তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মদান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নুরেমবার্গে গঠিত ট্রাইবুনালে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি নাৎসি দলেরও বিচার ও শাস্তি হয়েছিল যুদ্ধাপরাধের দায়ে। ইউরোপে নাৎসি পার্টি এখনও নিষিদ্ধ। যুদ্ধাপরাধ অস্বীকার, এমনকি নিহতের সংখ্যা কমিয়ে বলাও ইউরোপের বহু দেশে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যে ধরনের আইন বাংলাদেশের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। '৭২-এর সংবিধানপ্রণেতারা ধর্মকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে পৃথক করেছিলেন ধর্মের নামে হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন-ধ্বংসকে মহিমান্বিত করার ধর্মদ্রোহী ও মানবতাবিরোধী রাজনীতি নিরুৎসাহিত করার জন্য। আমরা যদি খালেদা-নিজামীদের তামসিক যুগে ফিরে যেতে না চাই যুদ্ধাপরাধী এবং জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসের জন্মদাত্রী জামায়াতকে অবশ্যই 'আন্ত র্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে' বিচার করতে হবে। যে জেনারেলরা '৭২-এর সংবিধানের উপর বলাৎকার চালিয়েছেন 'বিসমিল্লাহ...' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংযোজন করে তাদের ধার্মিক মনে করার কোন কারণ নেই। ধর্মকে তারা নিছক রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন স্বাধীনতার প্রত্যাশা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে টুঁটি চেপে হত্যার জন্য, যেমনটি জামায়াতিরা এবং তাদের পাকিস্তানি প্রভুরা করেছে '৭১-এ।

সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল হলেও 'বিসমিল্লাহ...' ও 'রাষ্ট্রধর্ম' থাকবে বলে আমাদের মন্ত্রীরা যেসব কথা বলছেন তাতে এটাই প্রমাণ হচ্ছে— সংবিধানে

'বিসমিল্লাহ...' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংযোজন করে জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ সঠিক কাজ করেছেন। আমরা এতদিন যারা এসবের সমালোচনা করেছি বিএনপি-জামায়াত কখনও ক্ষমতায় এলে আমাদের ব্লাশফেমির মামলায় ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে। অথচ আমরা কীভাবে ভুলে যাব ইসলামের দোহাই দিয়ে বিসমিল্লাহ বলেই জামায়াত ও তাদের সহযোগীরা '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি এবং পরে সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা ও ধর্ষণ করেছে। 'বিসমিল্লাহ' বলে এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে কাউকে হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন করলে কি তা বৈধ হয়? এ কথা আমরা বহুবার বলেছি— জামায়াতের আল্লাহ ও ইসলাম আর আমজনতার আল্লাহ ও ইসলাম এক নয়। '৭১-এ জামায়াত পাকিস্তানকে ইসলামের সমার্থক এবং আল্লাহর ঘর বিবেচনা করে জেহাদ করেছে, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন ইত্যাদি করেছে। জামায়াত এবং তাদের সহযোগীদের ওহাবি ইসলাম রক্ষার ঠিকেদারি কেউ মহাজোট সরকারকে দেয়নি।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি '৭২-এর সংবিধানের চার মূলনীতিতে ফিরে যেতে হলে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে, যার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মহাজোট সরকার এবং মহাজোটের শরিক দলগুলোর। এর পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পেশাজীবী সংগঠনসমূহ এবং নাগরিক সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে চেতনার উদ্বুদ্ধ হয়ে। সরকার, দল ও নাগরিক সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ ও গণজাগরণ ছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের সুষ্ঠু বিচার যেমন সম্ভব হবে না, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন কখনও বাস্তবে রূপায়িত হবে না।*

২৬ জুলাই ২০১০

---

* একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ২৬ জুলাইয়ের সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ

বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের দোলাচলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

'৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ও প্রধান নাগরিক আন্দোলনের দাবি। যুদ্ধাপরাধ বলতে বাংলাদেশের আমজনতা মনে করেন মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত সকল অপরাধ— '৭৩-এর আইনে বর্ণিত গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, জেনেভা কনভেনশনের লংঘন ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ রাজাকারকেও যুদ্ধাপরাধী মনে করেন। মন্ত্রীরা যখন বলেন আমরা যুদ্ধাপরাধের বিচার করব না, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করব তখন মানুষ বিভ্রান্ত হন। এর পাশাপাশি বিচার নিয়ে আগ্রহী আন্দোলনকারীদের ভ্রুকুঞ্চিত হয়— কোন অপরাধে কার বিচার কীভাবে কতদিনে হবে এসব বিষয়ে মন্তব্য করবার এখতিয়ার কার— মন্ত্রীদের না ট্রাইবুনালের? ট্রাইবুনাল তো মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি কোন সংস্থা নয়!

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলন ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সংগঠিতভাবে সূচিত হয়েছে বটে, তবে দাবি উচ্চারিত হয়েছে ১৯৭২-এর মার্চে। আজকের প্রজন্মের জানবার কথা নয়— সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে রাজপথে প্রথম যে মিছিল নেমেছিল সেটি ছিল '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে। ১৭ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত থেকে মিছিল শুরু হয়েছিল, শেষ হয়েছিল বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট স্মারকপত্র প্রদানের মাধ্যমে। কোন সংগঠনের ব্যানারে নয়, মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্বজন এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। এই মিছিল আয়োজন করতে গিয়েই শহীদজননী জাহানারা ইমাম এবং অন্যান্য শহীদ পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয়। সেই থেকে রাস্তায় আছি— ৩৮ বছর কেটে গেছে বিচারের অপেক্ষায়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের উদ্যোগ প্রথম গ্রহণ করেছিল সৈয়দ নজরুল-তাজউদ্দিন নেতৃত্বাধীন মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এইচ টি ইমাম '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের গণহত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ, অপহরণ প্রভৃতি তদন্ত করে প্রতিবেদন পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা ও থানা পর্যায়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের। বঙ্গবন্ধু '৭২-এর ২৪ জানুয়ারি দালাল আইন প্রণয়ন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আরম্ভ করেন। এই বিচারের সমস্যা ছিল প্রচলিত ফৌজদারি আইনে। ১৮৯৮ সালে প্রণীত ফৌজদারি কার্যবিধিতে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারের কোন সুযোগ নেই। এই সব অপরাধ আইনশাস্ত্রে সংজ্ঞায়িত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত 'আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনাল' যা নুরেমবার্গ ট্রাইবুনাল নামে পরিচিত তার নীতি প্রণয়নের সময়।

এই সব অপরাধে হিটালারের সরকার, দল ও বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিচার ও শাস্তি হয়েছিল। একই একই নীতি অনুসৃত হয়েছে জাপানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় টোকিও ও ম্যানিলা ট্রাইবুনালে।

ফৌজদারি আইনে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার সম্ভব নয় বলেই বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই এই সব অপরাধের জন্য দায়ী সংগঠন, বাহিনী ও সহযোগীদের বিচারের জন্য 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন' প্রণয়ন করেন। ভবিষ্যতে কেউ যাতে এই আইন বাতিল বা চ্যালেঞ্জ করতে না পারে তার জন্য এটি প্রণয়নের আগে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে।

১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সহযোগীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে দালাল আইন বাতিল করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করে, তাদের কারামুক্ত করে দল করার অধিকার দিয়েছিলেন বটে— '৭৩-এর আইন বাতিল করতে পারেননি, এটি সংবিধানের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার কারণে। ১৯৯১-এর ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে সমঝোতার সুযোগে জামায়াতে ইসলামী যখন সংবিধান লংঘন করে শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে দলের আমীর ঘোষণা করে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম যৌক্তিক কারণে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতি বিশেষ ট্রাইবুনালে গোলাম আযম সহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে গঠিত 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। এরপর শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সর্বদলীয় '... জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়েছে, যুদ্ধাপরাধের দায়ে গোলাম আযমের প্রতীকী বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে গণআদালতে, তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

১৯৯২-এর ২৬ মার্চ গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠানের পরদিন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আমাকে ও নাসিরউদ্দিন ইউসুফকে তাঁর দফতরে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের কোন তথ্যপ্রমাণ যদি আমাদের হাতে থাকে আমরা আদালতে কেন যাচ্ছি না, কেন গণআদালত করে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছি। আমরা বলেছি ফৌজদারি আইনে, ফৌজদারি আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোন সুযোগ নেই বলেই এর জন্য '৭৩-এ বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী সরকারকে ট্রাইবুনাল গঠন করতে হবে, মামলার বাদীও হতে হবে সরকারকে। আর গণআদালত আন্তর্জাতিক রীতিসম্মত জনগণের প্রতিবাদ ও ক্ষোভ জ্ঞাপনের অভিব্যক্তি, গণআদালতের অর্থ আইন হাতে তুলে নেয়া নয়। ১৯৯২-এর খালেদা জিয়া ২০০১-০৬-এর মতো জামায়াতপ্রেমে অন্ধ স্বৈরাচারিণী ছিলেন না। গণআদালত আয়োজনের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করেছিলেন, ২০০১-০২-এর মতো রাষ্ট্রদ্রোহী বানিয়ে জেলে নিয়ে নির্যাতন করেননি।

শুরু থেকে বার বার বলছি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে '৭৩-এর আইনে বিশেষ ট্রাইবুনালে, কোন অবস্থায় প্রচলিত আইনে নয়। নির্মূল কমিটি গঠনের পর থেকে শুধু বিএনপি নয় জামায়াতও চাইছে আমরা যেন বিশেষ ট্রাইবুনালে না গিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রচলিত আদালতে যাই। তারা এটা ভালভাবেই জানে ফৌজদারি আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব নয়। ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কয়েকজন কর্তাব্যক্তি যখন বললেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া উচিৎ এবং ভুক্তভোগীদের কেউ যদি মামলা করেন সরকার তাদের সহযোগিতা করবে তখন কিছু শহীদ পরিবারের সদস্য আপনজনের হত্যার জন্য থানায় বা আদালতে গিয়ে মামলা করেছেন, আবার কেউ কেউ পরিচিতি লাভের আশায়ও মামলা করেছেন। কেরাণীগঞ্জে একজন মুক্তিযোদ্ধা হত্যার জন্য জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের অভিযুক্ত করে জনৈক মুক্তিযোদ্ধার মামলা দায়ের এরকমটি মনে হয়েছে। এই সুযোগে জামায়াতের কিছু লোকও '৭১-এর হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠন ও গৃহে অগ্নিসংযোগের দায়ে জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এমনকি ছাত্রশিবিরের এক প্রাক্তন কর্মী অস্ট্রেলিয়ার এক আদালতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে '৭১-এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে মামলা করে খবরের কাগজে ঝড় তুলেছিল। কেউ কেউ তখন আমাদের কটাক্ষ করে এমন কথাও বলেছিলেন, এত বছর আন্দোলন করে আমরা কিছুই করতে পারিনি যা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী এক বাঙালি যুবক করে দেখিয়েছে। এই যুবকও উত্তেজিত ও উচ্ছসিত হয়ে আমাকে ফোন করে বলেছিল আমরা যা পারিনি ও তা করেছে, আমাদের কাছে যা তথ্যপ্রমাণ আছে যেন ওকে পাঠাই। আমি ওকে নিরুৎসাহিত করে বলেছি মামলা আমলে নেয়া না হলে জামায়াত এর সুযোগ নেবে। ওকে নিবৃত্ত করতে পারিনি, আদালত মামলা গ্রহণ করেনি। পরে শুনেছি সেই যুবকই নাকি জালিয়াতির মামলায় আসামী হয়েছিল সেখানে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখন বিভিন্ন থানা ও আদালতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতনামাদের নামে '৭১-এর হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসের জন্য মামলা নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, এবং আমাদের বন্ধুদের কেউ কেউ ঘটা করে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন— তখন বিচারপতি কে এম সোবহান বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, '৭১-এর যুদ্ধকালীন অপরাধের জন্য প্রচলিত আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য আমরা বারণ করছি। আমাদের নিষেধ উপেক্ষা করে কেউ যদি মামলা করেন তাকে আমরা জামায়াতের দোসর হিসেবে চিহ্নিত করতে বাধ্য হব। এতে আমাদের বন্ধুরা নিবৃত্ত হয়েছিলেন বটে, জামায়াতকে পারা যায়নি। গত তিন বছরে দেশের বিভিন্ন থানায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতাদের নামে কয়েকশ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০০৮-এর নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীনে মহাজোট যে অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করেছে তার প্রধান কারণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতি অঙ্গীকার। মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচারের জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। প্রথমে সরকারের শীর্ষ নেতারা জাতিসংঘের সহযোগিতায় বিচারের কথা বলেছিলেন। আমরা বলেছি যে সব দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য

নিজস্ব আইন বা আদালত নেই তারা জাতিসংঘের সহযোগিতা চাইতে পারে— আমাদের একটি অসাধারণ আইন রয়েছে, অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন বিচারক, আইনজীবী ও তদন্তকারী রয়েছেন; আমাদের জাতিসংঘে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রস্তাব সরকারের নীতি নির্ধারকরা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন।

সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কিছু অবনতি ঘটেছিল ট্রাইবুনালের স্থান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতার জন্য বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানীর নেতৃত্বে একটি নাগরিক কমিশন গঠন করেছিলাম, বিচারের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে আইনমন্ত্রীকে আমাদের সুপারিশ লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম ২০০৯-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি। এতে আমরা বিচারের স্থানের জন্য পুরাতন হাইকোর্ট ভবন নির্বাচনের প্রস্তাব করেছিলাম। পরে জানলাম এই ভবনে নয়, আবদুল গণি রোডের একটি টিনের চালের মর্চেপড়া ছোট বাড়িতে এই বিচার হবে। এ নিয়ে হইচই করে কর্তাদের টনক নড়াতে না পেরে বাধ্য হয়ে গত ডিসেম্বরে (২০০৯) আমরা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের প্রস্তাবিত পুরাতন হাইকোর্ট ভবনকেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য নির্বাচন করা হয়।

পরে ঝামেলা বেঁধেছিল ট্রাইবুনালের প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে '৭১-এ পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও জামায়াত সমর্থক আবদুল মতিনের নিয়োগকে কেন্দ্র করে। আমরা তার নিয়োগ বাতিলের দাবি করায় সরকারের কিছু কর্মকর্তা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এরপর প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ নেতা মতিনের নিয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলায় তাকে যেতে হয়েছে, যদিও দুজন মন্ত্রী বলেছেন মতিনের নিয়োগ নাকি সঠিক ছিল। সম্প্রতি আমাদের পাটমন্ত্রী বলেছেন, নিজামীদের সঙ্গে তিনি একমত, তারা নাকি '৭১-এ যুদ্ধাপরাধ করেনি, তারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে! জামায়াত যদি মন্ত্রীর এই মন্তব্য আদালতে তাদের পক্ষে পেশ করে মামলা জেতার জন্য ব্যারিস্টার রাজ্জাকের প্রয়োজন হবে না।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য '৭৩-এর আইন অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত ট্রাইবুনাল গঠিত হলেও এটিকে এখনও পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যাবে না। এখনও যথেষ্ট সংখ্যক আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তা নিযোগ দেয়া হয়নি, পুরাতন হাইকোর্টের সামান্য অংশ ট্রাইবুনালকে বরাদ্দ করা হয়েছে, পুরো অংশ জুড়ে এখনও সেখানে আইন কমিশনের দফতর রেখে দেয়া হয়েছে। ভবনের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই, এখনও ট্রাইবুনালের নিয়মাবলীর গেজেট প্রকাশ করা হয়নি। প্রয়োজনীয় পরিবহন, গবেষণাসামগ্রী, আসবাবপত্র কোন কিছুই নেই। এক কথায় বলা যায় ট্রাইবুনালকে পুরীর মন্দিরের ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে। ট্রাইবুনালকে কার্যক্ষম ও গতিশীল করবার জন্য গত ৭ জুলাই (২০১০) আমরা এর সঙ্গে যুক্ত সরকারের সাতজন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ৯টি প্রস্তাব করেছিলাম*, কোন কাজ হয়েছে

---

* পরিশিষ্ট-২ দেখুন

বলে মনে হচ্ছে না। এ চিঠিতে আমরা একটি উদ্বেগের কথা বলেছিলাম। সম্প্রতি জামায়াতের পাঁচজন শীর্ষ নেতার গ্রেফতার এবং নিকট অতীতে বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত '৭১-এর অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করে আশঙ্কা হচ্ছে, আমাদের আঠার বছরের আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ পরিবার, নির্যাতিত, ভুক্তভোগী ও মুক্তিযোদ্ধা সহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক বাঙালির সকল স্বপ্নের সলিল সমাধি রচিত হতে যাচ্ছে।

সরকার গত ২৯ জুন জামায়াতে ইসলামীর আমীর মতিউর রহমান নিজামী, সাধারণ সম্পাদক আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে গ্রেফতার করেছে। আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে একটি মামলায় উপস্থিত না হওয়ার কারণে আদালত তাদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে এবং তাদের যথারীতি গ্রেফতার করা হয়। পরদিন এই মামলায় তারা জামিন পেলেও তাদের বিরুদ্ধে পূর্বে দায়েরকৃত যেকটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়— অন্যতম হচ্ছে '৭১-এর হত্যা ও নির্যাতন। এরপর জামায়াতের অপর দুই প্রধান নেতা কামরুজ্জামান ও কাদের মোল্লাকে সরাসরি '৭১-এর গণহত্যার মামলায় গ্রেফতার করে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ ও মাঠপর্যায়ের তদন্ত আরম্ভ হয়ে গেছে, যে বিষয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনালের তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশন কিছুই জানেন না। বিএনপি ও জামায়াত চেয়েছিল '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের বিচার যেন ফৌজদারি আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী হয়। ট্রাইবুনালকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএনপি-জামায়াতের অভিপ্রায় অনুযায়ী '৭১-এর ঘাতকদের বিচার নিয়ে গেছে ফৌজদারি আদালতে।

জামায়াতের আবদুল মতিন ট্রাইবুনাল থেকে সরে যাওয়ার পর আমরা জানতে চেয়েছিলাম এই ব্যক্তিকে কে বা কারা কাদের সুপারিশে নিয়োগ দিয়েছেন এটা আমাদের জানা দরকার। শর্ষের ভেতর ভূত থাকলে সেই শর্ষে দিয়ে যেমন ভূত তাড়ানো যায় না একইভাবে সরকার ও প্রশাসনে যুদ্ধাপরাধীদের প্রকৃত দোসরদের অবস্থান যদি অব্যাহত থাকে সেই সরকার বা প্রশাসনের নিকট যুদ্ধাপরাধের বিচার আশা করা যায় না। '৭১-এর যুদ্ধকালীন অপরাধের জন্য যদি জামায়াত নেতাদের প্রচলিত আদালতে বিচার হয় এবং ফৌজদারি আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে তারা যদি উপযুক্ত শাস্তি না পান তার দায় প্রশাসনের ঘাপটি মেরে বসে থাকা জামায়াতিদের নয়, গোটা মহাজোট সরকারকে বহন করতে হবে। নিজামী-মুজাহিদ-সাঈদী-কামরুজ্জামান, কাদের মোল্লা ও অন্য জামায়াত নেতাদের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রচুর লিখিত, চলচ্চিত্রিক, আলোচত্রিক ও কথ্যপ্রমাণ দেশে ও বিদেশে রয়েছে ঠিকই, তবে এদের বিচারের এখতিয়ার একমাত্র 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল'-এর ফৌজদারি আদালতের নয়।

আমাদের জানা দরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আমাদের পুলিশের কর্মকর্তারা আইনকানুন কিছু না জেনেই কি জামায়াতের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন অপরাধের মামলা দায়ের করেছেন? তারা কি আশা করেন রিমান্ডে নেয়া নিজামী, কামরুজ্জামান,

কাদের মোল্লারা গড় গড় করে বলে দেবেন '৭১-এ তারা কীভাবে এসব অপরাধ করেছেন? শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিযুক্ত করছি কেন, আমাদের আইন প্রতিমন্ত্রীও তো বলেছেন যুদ্ধাপরাধীদের ধরা হয়েছে, বিচার শুরু হয়েছে এবং এ বছরের ভেতর বিচার শেষও হয়ে যাবে। প্রতিমন্ত্রী সব জানেন, অথচ যেখানে বিচার হবে সেই ট্রাইবুনাল কিছুই জানে না।

যে আদালতে নিজামীদের '৭১-এর অপরাধের বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেই আদালতের বিচারক এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আমি তিরিশ লক্ষ শহীদ পরিবারের একজন প্রতিনিধি হিসেবে বিনীত আবেদন জানাতে চাই— আপনারা '৭৩-এর আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইনটি পড়ুন। দয়া করে বলুন, ফৌজদারি কার্যবিধিতে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের কোন সুযোগ নেই, এর এখতিয়ার একমাত্র 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের। এক অপরাধে একজন ব্যক্তির দুবার বিচার করা যায় না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ফৌজদারি আদালতে হলে নবগঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল এবং মহাজোট সরকারের অঙ্গীকার মস্ত প্রহসনে পরিণত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলব, ছাত্রলীগের মধ্যে শুধু শিবির ঢোকেনি, আওয়ামী লীগেও জামায়াত ঢুকেছে। এদের দলে রেখে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দূরে থাক আপনার এবং আমাদের রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কেও আমরা যারপরনাই শংকিত। আপনার সরকারের সময়কালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল যদি শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের অর্থবহ ও মানসম্পন্ন বিচার করতে না পারে— আর কখনও এই বিচার সম্ভব হবে না।

১৮ জুলাই ২০১০

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং
ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে প্রত্যাবর্তন সভ্যতার দাবি

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যারা বাংলাদেশে তিরিশ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, যারা সোয়া চার লক্ষ নারীর উপর পাশবিক নির্যাতনের জন্য দায়ী, যারা এক কোটি মানুষকে বাধ্য করেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে শরণার্থীর বিড়ম্বিত জীবন যাপনে; তাদের বিচারের দাবি উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই। সেই সময় মুজিবনগর সরকার শত্রু কবলিত বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামের গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিল। '৭২-এর ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে প্রথমেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে প্রায় সাড়ে সাত শ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড সহ বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে দালাল আইন বাতিল করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ এবং গ্রেফতারকৃত বিচারাধীন ও দণ্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি প্রদান করেন। একই সঙ্গে '৭২-এর সংবিধান সংশোধন করে যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি করার অধিকারও তিনি ফিরিয়ে দেন।

সামরিক শাসক জিয়া বন্দুকের জোরে সংবিধান সংশোধন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করেছেন বটে সাধারণ মানুষ তা কখনও মেনে নেয়নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের নাগরিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল জিয়ার জীবদ্দশাতেই, যা পরে খালেদা জিয়ার আমলে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সংগঠিত রূপ নিয়ে সারা দেশে এবং দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

'৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের প্রধান সহযোগী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে স্মরণকালের ইতিহাসের যে নৃশংস গণহত্যা ও নির্যাতন সহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করেছিল তার একটি রাজনৈতিক দর্শন রয়েছে। জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ইসলাম তথা নব্য ওয়াহাবিবাদের অনুসারী। জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা মনে করে তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইসলাম অর্থাৎ মওদুদিবাদ সবাইকে মানতে হবে, যারা মানবে না তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা, তাদের হত্যা ও নির্যাতন করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েজ। '৭১-এ তারা পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার দোহাই দিয়ে যাবতীয় হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ডকে বৈধতা প্রদান করেছে। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীরা '৭২-এর সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন।

'৭২-এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ আকস্মিক কোনও সিদ্ধান্তের বিষয় ছিল না। ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে বাঙালি জাতির সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামকে পাকিস্তানি শাসকরা আখ্যায়িত করেছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ইসলামবিরোধী ভারতীয় চক্রান্ত হিসেবে। পাকিস্তানি শাসক এবং তাদের এদেশীয় সহযোগীরা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকেও একইভাবে পাকিস্তান ও ইসলামবিরোধী ভারতীয় চক্রান্ত বলেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ছিলো তাদের বিবেচনায় 'দুস্কৃতকারী', 'ভারতের চর' ও 'ইসলামের দুশমন'। জামায়াতের নেতা গোলাম আযম তখন বলেছিলেন পাকিস্তান না থাকলে দুনিয়ার বুকে ইসলামের নাম নিশানা থাকবে না। জামায়াত মনে করে 'পাকিস্তান আল্লাহর ঘর', পাকিস্তান ও ইসলাম সমার্থক শব্দ। গণহত্যাকারী পাকিস্তানি জেনারেল ইয়াহিয়া, টিক্কা, নিয়াজী, ফরমান আলীরা জামায়াতের বিবেচনায় আল্লাহ-র ঘরের রক্ষক ইসলামের সিপাহসালার।

মুক্তিযুদ্ধের পরও মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের বাংলাদেশবিরোধী চক্রান্ত অব্যাহত ছিল। '৭১-এর পরাজয়কে কখনও তারা মেনে নিতে পারেনি। ১৯৭২-এর ৪ নবেম্বর গণপরিষদে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর সদ্যস্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর তা যৌক্তিক কারণেই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক অপশক্তির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। '৭২-এর সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি তাদের বিবেচনায় ছিল ইসলামবিরোধী ভারতীয় চক্রান্ত। ধর্মনিরপেক্ষতাকে এখনও তারা মনে করে ধর্মহীনতা, যার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। '৭২-এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু বলেছেন—

"ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাতে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা আইন করে ধর্মকে নিষিদ্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের বাধা দিবার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দিবার মত ক্ষমতা নেই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খৃষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরী, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিষ। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে— আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।" (গণপরিষদের ভাষণ, ১২ অক্টোবর ১৯৭২)

ধর্মনিরপেক্ষতার পাকিস্তানপন্থী সমালোচকরা সব সময় বলেন '৭২-এর সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ঢোকানো হয়েছে ভারতের সংবিধানের অনুকরণে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় কখনও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী দল আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে '৭০-এর নির্বাচনের আগেই ধর্মনিরপেক্ষতা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ষাটের দশকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রামে বাঙালিত্বের

যে চেতনা প্রবল হয়ে উঠেছিল তার প্রধান উপাদান 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালির সকল আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতিপক্ষ হিসেবে পাকিস্তানি শাসকরা যেহেতু ধর্মকে দাঁড় করিয়েছিল যৌক্তিক কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতা অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা। ধর্মের নামে হত্যা, ধর্ষণ, শাসন, শোষণ ও নির্যাতন বন্ধের জন্য '৭২-এর সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র অন্তর্ভুক্তি জরুরি ছিল। পৃথিবীর বহু দেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্র তুরস্কে ১৯২৫ সালে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের '৭২-এর সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিযুক্ত করার জন্য ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যা বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের সংবিধানেও নেই। প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে কোথাও সাংবিধানিকভাবে ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়নি। ভারতবর্ষের সংবিধানে রাষ্ট্রের অন্যতম নীতি হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনীর দ্বারা, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হওয়ার চার বছর পর। যারা বলেন ভারতের সংবিধানের আদলে আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযুক্ত হয়েছে তারা হয় অজ্ঞ অথবা মতলববাজ।

ধর্মের নামে রাজনীতি করার বিপদ আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা '৭২ সালেই অনুধাবন করেছিলেন। '৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হত তাহলে গত দুই দশকে আমরা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং জঙ্গী মৌলবাদের যে আশঙ্কাজনক উত্থান প্রত্যক্ষ করেছি তা সম্ভব হত না। জঙ্গী মৌলবাদের শিকার শুধু ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও সংস্কৃতিকর্মী নয়— আমরা জাতীয় নিরাপত্তা এবং বাঙালিত্বের চেতনা আজ হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে জঙ্গী মৌলবাদের এই উত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে '৭১-এর গণহত্যাকারীদের বিচার থেকে অব্যাহতি। প্রখ্যাত গণহত্যা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বেন কিরনান তার একাধিক লেখায় এবং আমার প্রমাণ্যচিত্র 'যুদ্ধাপরাধ ৭১'-এ বলেছেন, পাকিস্তানের যে সমরনায়করা বাংলাদেশে গণহত্যা করেছে তাদের বিচার হয়নি বলেই তারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে, পরবর্তীকালে যারা 'আলকায়দা'র জন্ম দিয়েছে। জঙ্গী মৌলবাদ সব সময় গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধকে বৈধতা দিয়েছে ধর্মের দোহাই দিয়ে।

শেখ হাসিনার মহাজোট সরকার '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রশংসিত হয়েছে। তবে এই বিচারকে কেন্দ্র করে অনেক বিভ্রান্তি সরকারি মহলে যেমন রয়েছে বিচারের পক্ষে অবস্থানকারী বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভেতরও রয়েছে। অনেকে বলছেন '৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের জন্য শুধু দায়ী ব্যক্তিদের বিচার হবে, কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের নয়। '৭১-এ জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতারা রাজাকার, আলবদর, আলশামস ইত্যাদি ঘাতক বাহিনী গঠন করে

যেভাবে হত্যা, ধর্ষণ, নিযাতন, লুণ্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল সেটা কোন ব্যক্তির খেয়ালখুশি নয়— দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা তাড়িত হয়ে এই সব জঘন্য অপরাধ করা হয়েছিল। '৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের জন্য ব্যক্তি যেমন দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী সংগঠন এবং সেই রাজনৈতিক দর্শন— যা গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধকে ধর্মের নামে মহিমান্বিত করে, এই সব অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং প্ররোচনা জোগায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ কারণেই নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালে হিটলারের নাৎসি পার্টি ও সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং সহযোগীদের বিচারের পাশাপাশি সাতটি নাৎসি সংগঠনের বিচার হয়েছিল। গণতন্ত্রের পীঠস্থান ইউরোপে এখনও নাৎসি পার্টি নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের জন্য 'ক' 'খ' 'গ' জামায়াত নেতার বিচার হবে কিন্তু দলের বিচার হবে না এটা যদি সরকারের অভিপ্রায় হয় তাহলে এই সব অপরাধের পুনরাবৃত্তি কখনও রোধ করা যাবে না। এ কারণেই যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়কে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। এ দাবি কোন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়— মানবতা ও সভ্যতার বোধ প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত।

১২ জুলাই ২০১০

ঢাকার ত্রি-মহাদেশীয় সম্মেলন ঃ
'৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং আন্তর্জাতিক জনমত

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার জাতীয় সংসদে তিন চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় গিয়ে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী যখন থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলছে— যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। প্রথমে জামায়াত প্রধান নিজামী নরম গলায় বলেছিলেন বটে— সরকার যদি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে জামায়াত মহাজোট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, কিন্তু প্রবল জনমতের কারণে সরকারকে এই বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছে। দেরিতে হলেও ২০১০-এর ২৫ মার্চ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক প্রণীত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন ১৯৭৩' অনুযায়ী 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল' গঠিত হয়েছে। এর পাশাপাশি বিচার বিঘ্নিত করার জন্য জামায়াত দেশে ও বিদেশে বহুমাত্রিক তৎপরতা আরম্ভ করেছে।

১৯৭৩-এর আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের জন্য বহির্বিশ্বে জামায়াত যে অপতৎপরতা চালাচ্ছে তার প্রতি পাকিস্তান ও সৌদি আরবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। বিদেশে তারা কিছু প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে (যেমন 'জাস্টিস কনসার্ন') এবং কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠন ভাড়া করেছে (যেমন 'ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশন') '৭৩-এর আইনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া ব্যাবহত করার জন্য। সম্প্রতি এরা লন্ডনে 'হাউস অব লর্ডস'-এ একটি সেমিনার করে আইবিএ-র '১৭ দফা সুপারিশ' অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে। লন্ডনের পত্রিকায় বেরিয়েছে দু মাস আগে জামায়াত লন্ডনে 'জাস্টিস কনসার্ন' গঠন করেছে। 'আইবিএ'-র সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দুই শীর্ষ জামায়াত নেতার পুত্র ও জামাতা।

দেশের ভেতরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য জামায়াত ২৭ জুন (২০১০) বিএনপির হরতালকে কেন্দ্র করে যে সুদূরপ্রসারী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের চক্রান্ত করেছিল— দলের তিন শীর্ষ নেতা গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদ থেকে থলের বুনো বেড়ালগুলো এক এক করে বেরুচ্ছে। জামায়াত আরও অনেক কিছু করবে এবং এটাই স্বাভাবিক। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিপক্ষের পূর্বাপর প্রতিক্রিয়া বিবেচনা না করেই কি সরকার '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মতো বিশাল একটি কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেছে? আমরা গত দেড় বছর ধরে দেশে ও বিদেশে জামায়াতের এসব তৎপরতা সম্পর্কে লিখছি। 'আইবিএ'-র কথিত ১৭ দফা সুপারিশ নিয়ে গত পাঁচ মাস

ধরে লিখছি, বিভিন্ন সেমিনারে বলছি, সরকারের নীতি-নির্ধারকরা এসব বিবেচনায় আনার প্রয়োজন বোধ করেননি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সাড়ে তিন মাস আগে যে ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে এখনও তা লোকবল ও অন্যান্য রসদের অভাবে ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। বার বার বলা সত্ত্বেও কেন পর্যাপ্ত সংখ্যক আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না, কেন বরাদ্দকৃত অর্থ ট্রাইবুনালকে দেয়া হচ্ছে না, কেন ট্রাইবুনালের জন্য বরাদ্দকৃত ভবন থেকে আইন কমিশনের দফতর অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তাদের বসার জায়গার ব্যবস্থা হচ্ছে না, কেন বিচারিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর কাজের কোন সমন্বয় হচ্ছে না— এ সবের উত্তর আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু জানি এ কাজগুলো সরকার করবে, বিরোধী দল নয়। ট্রাইবুনালের কাজ নির্বিঘ্ন না করে বিচার বানচালের জন্য ক্রমাগত বিরোধী দলকে দায়ী করার সরকারি মনোভাব আমজনতাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না।

গত ২০ জুন ঢাকায় 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি', 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র'-এর উদ্যোগে যে 'ত্রি-মহাদেশীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হল সেখানে অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল একাত্তরের গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার এগারটি দেশ থেকে চল্লিশ জন প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক এসেছিলেন এই সম্মেলনে অংশ নেয়ার জন্য। সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজকরা দেড়শ পৃষ্ঠার স্মরণিকা এবং প্রায় তিনশ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন যেখানে বাংলাদেশ সহ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের পঁয়ত্রিশ জন বিশেষজ্ঞ এ বিষয়গুলো নিয়ে লিখেছেন এবং সম্মেলনের কর্ম অধিবেশনে আলোচনাও করেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিঘ্নিত করার জন্য জামায়াতের শিখন্ডীরা যে সব প্রশ্ন তুলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তার জবাব দেয়া হয়েছে সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত 'জেনোসাইড, ওয়ার ক্রাইমস এ্যান্ড ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি ইন বাংলাদেশ ঃ ট্রায়াল আন্ডার 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইবুনালস) অ্যাক্ট নাইন্টিন সেভেন্টি থ্রি' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের আটজন প্রবীণ ও নবীন আইনজ্ঞ ১৯৭৩-এর আইনে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা উত্থাপন করে 'আইবিএ'র কথিত ১৭ দফা সুপারিশ-এর জবাব দিয়েছেন। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন নির্মূল কমিটির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার ড. তুরীন আফরোজ।

'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' সহ 'আইবিএ'র কিছু সুপারিশ সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে। এর একটি হচ্ছে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড সংক্রান্ত। ইউরোপ মৃত্যুদণ্ড রহিত করেছে বটে তবে ইউরোপের বাইরে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশেরও বেশি দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রেও এখন পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়নি। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড থাকবে অথচ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনাল মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে না এ প্রস্তাব কখনও মেনে নেয়া যায় না। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে যখন বিচারের প্রহসন করে মৃত্যুদণ্ড

দেয়া হয়েছিল 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' বা 'আইবিএ' তা বন্ধ করতে পারেনি। '৭১-এ বাংলাদেশের গণহত্যার কোন নিন্দা এসব সংগঠন করেছিল কি না আমাদের জানা নেই।

বাংলাদেশে গণহত্যাকারী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদন্ড সমর্থন করে কানাডার বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা, উত্তর আমেরিকার জুরিস্ট এসোসিয়েশনের প্রাক্তন প্রধান এ্যাটর্নি উইলয়াম স্লোন সম্মেলনে বলেছেন, তিনি বা তার দেশ মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে নয় কিন্তু বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনাল যদি কাউকে গণহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরাধীও কারাগার থেকে বেরিয়ে আসবে, অতীতে এমনটি ঘটেছে। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌম সত্তা এবং নিজস্ব আইনের ধারাবাহিকতা। যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌম সত্তাকে অশ্রদ্ধা করা। একইভাবে '৭৩-এর আইনের অন্যান্য সমালোচনারও কঠিন জবাব দেয়া হয়েছে যা সম্মেলনে উপস্থিত পাকিস্তানের আইনজীবী ও মানবাধিকার নেতারা শুধু সমর্থন করেননি— বলেছেন, দেশে ফিরে গিয়ে এই বিচারের পক্ষে জনমত সংগঠনে তারা সাহায্য করবেন। ২০ জুনের সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে। ৭১ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল ঢাকা সহায়ক মঞ্চ' গঠন যার দুজন সদস্য হচ্ছেন পাকিস্তানের মানবাধিকার নেতা কবি ও সাংবাদিক আহমদ সালিম ও 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিভিল লিবার্টিজ'-এর মহাসচিব এডভোকেট জাফর মালিক।

বিদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে এবং এই বিচারকে উপলক্ষ্য করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চলছে তা কূটনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে না। গত দেড় বছরে ইউরোপ ও আমেরিকায় দেড় ডজনেরও বেশি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, এ সব বিষয়ে আমাদের দূতাবাসগুলোর স্পষ্ট কোন ধারণা বা প্রস্তুতি নেই। গত ২৩ জুন ২০১০ 'হাউস অব লর্ডস'-এ 'জাস্টিস কনসার্ন'-এর নামে আয়োজিত সেমিনারে জামায়াত-বিএনপির আইনজীবীরা বাংলাদেশকে তুলোধুনো করেছেন, আমাদের রাষ্ট্রদূত সেখানে না গিয়ে সরকারের একটি নোট পাঠিয়েছেন। লন্ডনে আওয়ামী লীগের আইনজীবীরা এই সেমিনার বয়কট করেছেন। অথচ লর্ড এভবরিকে সামনে রেখে বিএনপি-জামায়াত এবং 'আইবিএ'-র কর্মকর্তারা যেসব প্রশ্ন তুলেছেন, '৭৩-এর আইনের যে সমালোচনা করেছেন তার দাঁতভাঙা জবাব নির্মূল কমিটির একাধিক প্রকাশনায় রয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন সময়ে সরকারের নীতি নির্ধারকদের দেয়াও হয়েছে।

২০ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সরকারের এসব অপূর্ণতা দূর করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে এবং জঙ্গী মৌলবাদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীদের একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ গঠনের বিষয়ে আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যা সম্মেলনে গৃহীত দশটি প্রস্তাব এবং নয় দফা ঢাকা

ঘোষণায় মূর্ত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ জুন (২০১০) গঠিত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল ঢাকা সহায়ক মঞ্চ।' ২০ জুনের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী এগারটি দেশের এবং যারা আমন্ত্রিত হয়েও বিভিন্ন কারণে অংশ নিতে পারেননি সেই সব দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী, আইনপ্রণেতা ও মানবাধিকার আন্দোলনের নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত এই মঞ্চ আমাদের ট্রাইবুনালকে প্রয়োজনে আইনি সহযোগিতার পাশাপাশি '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনমত সৃষ্টি করতে সহায়তা করবেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের জন্য দেশের ভেতরে যে সব চক্রান্ত হচ্ছে তা সরকারকে মোকাবেলা করতে হবে রাজনৈতিকভাবে এবং বিদেশে যেসব অপতৎপরতা চলছে তা প্রতিহত করতে হবে কূটনৈতিকভাবে। এ কথা আমি বহুবার বলেছি— যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সরকারের আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও বিচারের গুরুত্ব ও ধরন সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের স্বচ্ছ কোন ধারণাও নেই। সরকারকে মনে রাখতে হবে এ বিচার আওয়ামী লীগ করছে না, রাষ্ট্র করছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সমগ্র জাতির প্রত্যাশা এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। বিচার বানচালের জন্য যা কিছু করা সম্ভব জামায়াত তা করছে এবং করবে। যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে বিচার সম্পন্ন করার যাবতীয় কাজ সরকারকে এখনই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে গোটা জাতিকে সঙ্গে নিয়ে; বিচ্ছিন্ন, অদক্ষ বা বিভ্রান্তভাবে নয়।

৩ জুলাই ২০১০

আমরা সবাই ক্ষুব্ধ

একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, মহানগর ঢাকা মানুষের বাসযোগ্য কোন শহর নয়। নাগরিক সুযোগহীনতায় তালিকায় ঢাকা নিঃসন্দেহে বিশ্বের প্রথম মহানগর হবে। শহরের যানজট, বায়ুদূষণ, পয়োঃনিষ্কাশন সংকট, ফুটপাত দখল, যত্রতত্র আবর্জনার পাহাড় ইত্যাদির কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকার। একই সঙ্গে গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ সংকটের দায় বহন করতে হবে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে। ঢাকাবাসীর দুঃসহ দৈনন্দিন জীবনের ভয়াবহ চিত্র বর্ণনা করেছেন ঢাকা বিশেষজ্ঞ মুনতাসীর মামুন। ঢাকাঅন্তপ্রাণ মামুন প্রিয় নগর ঢাকার এ হেন দুর্দশায় বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হবেন এটা স্বাভাবিক। মামুনের লেখা 'এ দেশে জন্মে কি অপরাধ করেছি' (জনকণ্ঠ, ৯ জুন ২০১০) পড়ে সকাল থেকে আমাদের অনেক বন্ধু তাকে না পেয়ে আমাকে টেলিফোন করে তাদের ক্ষোভের অংশীদার করেছেন। মামুনকে বলেছি, এ ক্ষোভ তোমার একার নয়, আমাদের সকলের।

মামুন তাঁর লেখা শুরু করেছেন যানজটের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বর্ণনার মাধ্যমে। নগর কর্তৃপক্ষ ও ট্রাফিক কর্মকর্তারা টেলিভিশনের আলোচনায় এবং গোলটেবিল বৈঠকে সমস্যাটি যেভাবে তুলে ধরেন মনে হবে এর কোন আশু সমাধান নেই। নগরের যান-জনসংখ্যাবৃদ্ধি, মানুষ ও গাড়ির সংখ্যা অনুযায়ী রাজপথের অপ্রতুলতা, নগর পরিকল্পনার ত্রুটি, যানবাহন চালকদের মানসিকতা, আমলাতান্ত্রিকতা ইত্যাদি বিষয়ে তারা এমন সব গুরুগম্ভীর কথা বলেন শুনে যে কারও মনে হবে গোটা ঢাকা শহরকে ভেঙে নতুন করে না বানালে বুঝি এসব সমস্যা থেকে বাঁচবার কোন পথ নেই।

পঁচিশ বছর আগেও ভারতের রাজধানী দিল্লীর বায়ুদূষণ ও যানজট পরিস্থিতি ঢাকার চেয়ে খারাপ ছিল। দিল্লী পুলিশের কর্মকর্তা কিরণ বেদী এই সমস্যা নিরসনে দুটি কাজ করেছিলেন তাঁর সীমিত ক্ষমতার ভেতর। যে সব গাড়ির কালো ধোয়া বেরোয় এবং যে সব গাড়ি অনির্ধারিত জায়গায় রাখা হয় তার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচশ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা কারেছিলেন তিনি। এর সঙ্গে যোগ করলেন— কোন নাগরিক যদি পুলিশকে কোন গাড়ির কালো ধোঁয়া নির্গমন কিংবা 'রং পার্কিং'-এর সন্ধান দিতে পারে পুলিশ তাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেবে। রাতারাতি সরকারের আয় বেড়ে গেল বহুগুণ। দিল্লীর বেকার, ভবঘুরে, টোকাইরা সব বসে গেল নজরদারিতে। খবর দিতে পারলেই পঞ্চাশ টাকা আয়! পুলিশ অপরাধীর কাছ থেকে পাঁচশ টাকা জরিমানা আদায় করে পঞ্চাশ টাকা সংবাদদাতাকে দিয়ে সাড়ে চারশ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া আরম্ভ করল। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী। দিল্লী পুলিশের ডেপুটি কমিশনার কিরণ বেদী প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী সোনিয়া গান্ধীর গাড়ি 'রং পার্কিং'-এর জন্য 'টো' করে নিয়ে গেলেন। কিরণ বেদীকে

নিয়ে দিল্লীর কাগজে প্রশংসার যেমন ঝড় উঠেছিল, সমালোচনাও তাকে কম শুনতে হয়নি। পরে তাকে শাস্তিমূলকভাবে তিহার জেলে বদলী করা হল। সেখানে গিয়ে কিরণ বেদী জেলখানার সব নিয়ম কানুন এমনই বদলালেন মানবাধিকার সংগঠনগুলো তার নামে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। অবসর নিয়ে কিরণ এখন মানবাধিকার আন্দোলনের পুরোগামী নেত্রী।

একজন কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ কর্মকর্তা যা করতে পারেন আমাদের পুলিশের গোটা ট্রাফিক বিভাগ কেন তা করতে পারে না গোয়েন্দা লাগিয়ে এটা অনুসন্ধান করলেই জানা যাবে কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা কেন বলেছিলেন প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জামায়াত ও বিএনপির লোকজনরা শেকড় গেঁড়ে বসে আছে। নইলে এ প্রশ্নের জবাব তো পুলিশের ট্রাফিক বিভাগকে দিতে হবে— তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কোন জাদুবলে ঢাকায় যানজট ছিল না? সারাদিনের জন্য ঢাকার যানব্যবস্থা অচল করে দেয়ার জন্য দশটা নির্দিষ্ট মোড়ে দশজন সার্জেন্টই যথেষ্ট। ঢাকা শহরে অনির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্ক করার জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা, পর্যাপ্ত পার্কিং ছাড়া বাড়ি বানালে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা জরিমানার ঘোষণা দিলেই ঢাকার যানজট ৫০% লাঘব হবে। সততার সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশ কি এই সামান্য কাজটুকুও করতে পারে না?

রাজধানীতে গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে আইন রয়েছে প্রত্যেক বাড়ির নিজস্ব পার্কিং ব্যবস্থা থাকতে হবে। পার্কিং-এর জন্য নিধারিত স্থান ছাড়া কোথাও গাড়ি রাখা যাবে না। তত্ত্বাবধায়কের আমলে দেখেছি— বড় রাস্তার ধারে যে সব বাড়ির পার্কিং ব্যবস্থা ছিল না সেখানে নিচের তলার দোকানপাট ও যাবতীয় স্থাপনা ভেঙে রাতারাতি নিজস্ব পার্কিং ব্যবস্থা নির্মিত হয়েছে। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেসব জায়গায় আবার আগের মতো দোকানপাট গজিয়ে গেছে। 'রং পার্কিং'-এর জন্য এক হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করলে যানজট যেমন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে যাবে প্রতি বছর সরকারের শতাধিক কোটি টাকা আয়ও বৃদ্ধি পাবে। রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী রাখা যে শাস্তি যোগ্য অপরাধ এ আইন তৈরি হয়েছে বৃটিশ আমলে। পুলিশ ঘুষ খেয়ে 'রং পার্কিং' যেমন দেখে না নির্মাণ সামগ্রী রেখে রাস্তা দখলও দেখে না। একটি জনপ্রিয় সরকারকে অজনপ্রিয় করার এই কৌশল জামায়াত-বিএনপি কেন ছাড়বে?

পুরনো ঢাকার কথা বাদই দিচ্ছি, ঢাকার অভিজাত এলাকা হিসেবে যে সব অঞ্চল পরিচিত সেখানকার উপচে পড়া ডাস্টবিন কিংবা রাস্তাঘাটের দিকে তাকালে যে কোনও করদাতা এ প্রশ্ন করতেই পারেন— আমাদের করের অর্থ কাদের পকেটে যাচ্ছে? ঢাকার মেয়রের কাজ কী শুধু বিএনপি-জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয়া? খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা ভাল কাজ করেছিলেন। তাঁর সরকার পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য আইন করেছিল। পুরোপুরি বন্ধ না হলেও পলিথিনের ব্যবহার কমেছে, এ নিয়ে বিদেশীদের প্রশংসাও শুনেছি। সেই প্রশাসন এখন নদী-বায়ু-পরিবেশদূষণ নিয়ে দেশ ও সরকারের বারোটা বাজানোর দায়িত্ব নিয়েছে। জলাশয় দখল, নদীদূষণ ও গাছকাটা বন্ধের জন্য

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে— দায়িত্বহীনতা ও নির্দেশ অবজ্ঞায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘাপটি মেরে বসে থাকা চার দলীয় জোটের লোকজন এ বিষয়ে বিলক্ষণ অবগত রয়েছে— একটি জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভের ক্ষেত্র কীভাবে সৃষ্টি করতে হয়।

বিএনপি-জামায়াত জানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে যত আন্দোলনের ডাকই তারা দিক না কেন সাধারণ মানুষের সায় পাওয়া যাবে না। তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ নিয়ে আন্দোলনের কথা বললে থলের বেড়ালগুলো এক এক করে বেরিয়ে আসবে, এ নিয়ে তারা সুবিধে করতে পারবে না। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে— বিরোধী দল যখন আন্দোলনের ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না সরকার তখন ইস্যু তৈরি করে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। আমি জানি না সরকারকে এই পরামর্শ কে দিয়েছে 'চ্যানেল ওয়ান' ও 'আমার দেশ' বন্ধ করে মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করলে বিএনপিকে জব্দ করা যাবে? ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এসে আমাকে সহ জনকণ্ঠ সম্পাদক আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, কলামিস্ট মুনতাসীর মামুন, সাংবাদিক এনামুল হক ও সাংবাদিক সেলিম সামাদ সহ বহু সাংবাদিক গ্রেফতার করেছিল। বন্ধ করে দিয়েছিল একুশে টিভি। চার দলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছিল ষোলজন সাংবাদিককে। সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের জন্য যে ফাঁস খালেদা-নিজামীরা তৈরি করেছিলেন আখেরে সেই ফাঁসে তাদেরই ঝুলতে হয়েছে। কোনও পত্রিকা বা টেলিভিশনের মালিকানা বা লাইসেন্সে অনিয়ম থাকলে সরকার আবদালতের শরণাপন্ন হতে পারে, বিরোধী দলের গণমাধ্যম বন্ধ করে তাদের শায়েস্তা করার রীতি সভ্য সমাজে অচল।

মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারের আগে কী জানা ছিল না এই ব্যক্তি যে কুখ্যাত 'উত্তরা ষড়যন্ত্রের নায়ক' এবং জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠক হিজবুত তাহরীরের একজন গডফাদার? রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা উচিৎ ছিল অনেক আগে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একবার উদ্যোগ নিয়েও পরে কেন পিছিয়ে এসেছিল তার শানে নুজুল আমরা জানি। শেখ হাসিনার মহাজোট সরকার কেন মাহমুদুর রহমানের খুঁটোর জোরে ভীত হবে?

আদালতে মাহমুদুর রহমান যে সব বিপ্লবী কথা বলছেন, যেভাবে মানবাধিকারের কথা সরকারকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন আমরা যারপরনাই কৌতুক বোধ করছি। তাঁর উপর ভয়ঙ্কর নির্যাতনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, পুলিশ নাকি তাকে দিগম্বর করতে চেয়েছিল, থানায় খেতে দেয়া হয়নি, অন্ধকার ঘরে রাখা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মাহমুদুর রহমান কি ভুলে গেছেন তার সরকার আমাদের উপর কী নৃশংস নির্যাতন করেছিল? তখন কি আমাদের অনাহারে রাখা হয়নি? পানি খেতে চাইলে কি নোংরা নর্দমা দেখিয়ে দেওয়া হয়নি? মাসের পর মাস রাখা হয়েছিল অর্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায়, ভয়ঙ্কর সব দাগী আসামীদের সঙ্গে। ঈদের দিন যে কোন কয়েদী বাড়ি থেকে আনা খাবার খেতে পারে। আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ২০০১-এর ঈদের দিনে খাবার

নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেলগেটে দাঁড়িয়েছিল, দেখা মেলেনি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কত নৃশংস হতে পারে খালেদা-নিজামীদের জমানায় প্রতি মুহূর্তে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। আমাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল ৫৪ ধারায়। গ্রেফতারের সময় পুলিশ জানত না আমাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের মিথ্যা মামলা দায়ের করার হুকুম আসবে। মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে নির্দিষ্ট অভিযোগে। আজ যারা খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমানের গ্রেফতার নিয়ে বক্তৃতাবাজি করছেন তারা দয়া করে ২০০১ আর ২০০২-এর খবরের কাগজের পাতা উল্টে দেখুন, আদালতে দেয়া আমাদের জবানবন্দি পড়ুন। আমাদের তুলনায় মা. রহমান স্বর্গে আছেন।

মাহমুদুর রহমানরা ক্ষমতায় থাকতে আমাদের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে যে নির্যাতন করেছিলেন তার শত ভাগ নির্যাতনও তাদের ওপর করা হচ্ছে না। তারপরও আমি 'আমার দেশ'-এর প্রকাশনা সংক্রান্ত মামলায় মাহমুদুর রহমানের গ্রেফতারের সমালোচনা করেছি । একইভাবে 'চ্যানেল ওয়ান' বন্ধ করারও নিন্দা করেছি। খালেদা-নিজামীরা কদর্যতা ও বর্বরতার যে সব রাস্তা নির্মাণ করেছেন শেখ হাসিনার সরকার কেন সেই রাস্তায় হাটবে? সরকার কি জানে না এসব রাস্তার শেষ গন্তব্য কোথায়?

আমরা চাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দ্রুত ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংবিধান ফিরে আসুক। দল হিসেবে জামায়াত যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমরা চাই বিচার আরম্ভের আগেই যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করা হোক। জামায়াতে রাষ্ট্রদ্রোহী ও সংবিধানবিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ করতে ব্যর্থ হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যেমন কঠিন হবে বাংলাদেশ পরিণত হবে পাকিস্তানের মতো জঙ্গী মৌলবাদীদের স্বর্গরাজ্যে। জামায়াত শুধু যুদ্ধাপরাধীদের দলই নয়, জামায়াত জঙ্গী মৌলবাদীদেরও গড ফাদার। জঙ্গী নির্মূল এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগে সরকার বিরোধী দলের হাতে অযৌক্তিক আন্দোলনের কোন হাতিয়ার তুলে দিক এটা আমাদের কাম্য নয়। মুনতাসীর মামুনকে আবারও ধন্যবাদ— আমাদের সকলের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও হতাশার কঠিন চিত্রটি তীব্র সহজ ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন।

১০ জুন ২০১০

যুদ্ধাপরাধের বিচার ঃ সরকার রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের ভুমিকা

১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠন করে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তাদের মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে শহীদজননী জাহানারা ইমাম যে অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে আজ তা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। প্রকৃত বিজয় তখনই অর্জিত হবে যখন '৭১-এর গণহত্যাকারী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে এবং যে রাজনীতি এ সকল অপরাধকে ধর্মের নামে বৈধতা দিয়েছে '৭১-এ এবং এখনও দেয়— তার অবসান ঘটবে সাংবিধানিক ও সামাজিকভাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহাজোট সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭৩-এ বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক প্রণীত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন' অনুযায়ী গত ২৫ মার্চ (২০১০) 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠন করেছে। ট্রাইবুনালে তিন জন বিচারক নিয়োগ দেয়া হলেও এ পর্যন্ত ঘোষিত ১২ জন আইনজীবী এবং ৭ জন তদন্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এখনও সম্পন্ন হয়নি যদিও আমরা বলেছি ট্রাইবুনালে আরও অধিক সংখ্যক আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তা প্রয়োজন। যাকে প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে ট্রাইবুনালের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার সম্পর্কে শুধু গণমাধ্যম নয়, প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা এবং মহাজোটের দুজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও সাংসদ অভিযোগ করেছেন— তিনি ছাত্রজীবনে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র সংঘে'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং '৭১-এর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দখলদার সরকারের অধীনে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতির অনুসারীকে যদি '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের তদন্ত করতে দেয়া হয় তা শুধু বিচারকার্যকে ব্যহত করবে না, গোটা ট্রাইবুনাল এবং সরকারের উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। এই কর্মকর্তার দায়িত্ব গ্রহণের পর কয়েকটি সংগঠন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাকে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধ ও যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে কিছু প্রকাশনা ও দলিলপত্র হস্তান্তর করেছে বটে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' জানিয়েছে ট্রাইবুনাল পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণের আগে কোনও দলিলপত্র হস্তান্তর করা হবে না।

৩০ এপ্রিল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা ইসলামী ছাত্র সংঘের একটি কলেজ শাখার সভাপতি পদের জন্য

মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। তিনি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ তদন্ত কমিটির প্রধান হওয়ায় বিচারের অবস্থা কী দাঁড়াবে তা নিয়ে আমাদের সিরিয়াসলি ভাবতে হবে।' এই গোলটেবিল বৈঠকে অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ আরও বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীরা প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে আছে। তারা প্রতিটি পদে বাধার সৃষ্টি করছে। (জনকণ্ঠ, ১ মে ২০১০)

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন, বিদ্যুৎ বিভাগ সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষের লোকজন কীভাবে সেবাখাতগুলো অকেজো করার ষড়যন্ত্র করছে। মহাজোট সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর থেকে আমরা বলছি, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জামায়াতের লোকজন যেভাবে ঘাপটি মেরে বসে আছে— যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দূরে থাক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সরকার পরিচালনাই কঠিন হয়ে পড়বে।

জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রশাসনের ভেতরে থেকে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালানোর পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনালের বিভিন্ন কার্যক্রম অচল করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। ছাত্রজীবনে জামায়াতের কর্মী এবং '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত আবদুল মতিন কীভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন এর যথাযথ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক পরিচয় বাদ দিলেও গত এক মাসে প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মতিনের কার্যক্রম বহু প্রশ্ন ও সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। '৭৩-এর 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাস) আইন'-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে— 'তদন্ত সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম প্রসিকিউশনের অধীন হবে', অথচ জনাব মতিন শুরু থেকে তাঁর সকল কর্মকাণ্ড এডভোকেট গোলাম আরিফ টিপুর নেতৃত্বে গঠিত প্রসিকিউশন থেকে গোপন রেখেছেন। একবার তিনি বললেন তদন্ত শেষ করতে দু বছর সময় লাগবে, আবার কদিন আগে বললেন— এই মে মাসের ভেতর নাকি কয়েকজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেবেন। কাদের বিরুদ্ধে কিসের ভিত্তিতে জনাব মতিন চার্জশিট দেবেন আমরা জানি না, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীরা যে দেশ ছেড়ে পালানো আরম্ভ করেছে সে বিষয়ে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাছাড়া ফৌজদারি আইনের মতো '৭৩-এর আইনে তদন্তকারীদের চার্জশীট প্রদানের কোন ধারা বা বিধান আছে বলে আমাদের জানা নেই।

ট্রাইবুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা গত এক মাসে বাংলাদেশের কোন বধ্যভূমি পরিদর্শন করেছেন কিংবা শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের এলাকায় গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী কারও জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেছেন এমন তথ্য আমাদের জানা নেই। দেশের বাইরে কোথায় কোথায় '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের তথ্যপ্রমাণ আছে সেসবও জানার কোন প্রয়োজন বোধ করেননি ট্রাইবুনালের প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা আবদুল মতিন— অথচ চার্জশিট প্রায় তৈরি করে ফেলেছেন! এ হেন অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ ব্যক্তির নেতৃত্বে তদন্ত সংস্থা পরিচালিত হলে জামায়াত ও

যুদ্ধাপরাধীর উল্লসিত হতে পারে— আমরা যারা ভুক্তভোগী তাদের উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের সঙ্গে নিজের সম্পৃক্তি অস্বীকার করে ২ মে আবদুল মতিন সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি কখনও ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য ছিলেন না এবং তিনি যখন ছাত্র ছিলেন বরিশালে বিএম কলেজ বা অন্য কোথাও ইসলামী ছাত্র সংঘের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর এই বক্তব্য খন্ডন করা হয়েছে দৈনিক যুগান্তরের প্রতিবেদনে। 'ছাত্র সংঘেরই ভিপি প্রার্থী ছিলেন মতিন ঃ জানালেন বরিশালের জামায়াত নেতা' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— 'অসত্য বলেছেন আবদুল মতিন। ১৯৬৩ সালে বরিশাল বিএম কলেজে ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রার্থী হিসেবেই ভিপি পদে নিবাচন করেছিলেন তিনি। তৎকালীন সময়ের প্রভাবশালী ছাত্রসংঘ নেতা বর্তমানে জামায়াতের রোকন অ্যাডভোকেট মহিউল ইসলাম তাহের জানিয়েছেন এ তথ্য। বিএম কলেজ ছাত্র সংসদ বাকসুর রেকর্ডপত্র ঘাঁটলেই এর দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি। এদিকে ১৯৬৩ সালে বরিশালে ইসলামী ছাত্রসংঘ নামে কোন সংগঠন ছিল না বলে আবদুল মতিনের দেয়া বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন '৬২-'৬৩ সালে পরপর দু'বার বিএম কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি বর্তমানে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সংসদ সদস্য আমীর হোসেন আমু। বিএম কলেজ তথা বরিশাল শহরে ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মকাণ্ড ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সে সময় হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন চলাকালে বাধা দিয়েছিল ছাত্রসংঘ। সদর রোড এলাকায় মিছিলের সামনে দেয়া হয় ব্যারিকেড। অতএব কেউ যদি বলে, তখন ছাত্রসংঘ ছিল না, তা ঠিক নয়।' (যুগান্তর, ৪ মে ২০১০)

জনাব মতিন সম্পর্কে এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় এবং তার অপসারণের আশংকায় ক্ষুব্ধ হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম'। ৪ মে ২০১০ তারিখে প্রকাশিত— 'চোখ বন্ধ করে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সম্মত এক তদন্ত-সংস্থা প্রধান খোঁজা হচ্ছে ঃ স্বমনোনীত স্বনিয়োজিত তদন্ত প্রধান সম্পর্কে সরকারের হাস্যকর অভিযোগ' শীর্ষক দীর্ঘ প্রতিবেদনে আবদুল মতিনের যোগ্যতা ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডঃ আলাউদ্দিনকে তুলোধুনো করা হয়েছে। জনাব মতিন সম্পর্কে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— 'সরকারের ভেতরের একটি শক্তিশালী মহল তদন্ত সংস্থার বর্তমান প্রধানকে অপসারণ করে তার স্থলে তাদের ইচ্ছাপূরণের রোবট হিসেবে একজনকে বসাতে চান বলে ধারণা করা হচ্ছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, সরকার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত যাচাই-বাছাই করেই তদন্ত সংস্থার প্রধানকে নিয়োগ করেছেন। তাদের ঘরানার লোক হিসেবে শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে সরকার এমন একটি স্পর্শকাতর পদে আবদুল মতিনকে নিয়োগ দেননি। তবে তদন্ত সংস্থার প্রধান একজন সাবেক বিচারক সম্ভবত পুরোপুরি সরকারের রাজনতিক ভাঁড় হিসেবে ব্যবহৃত হতে রাজি না হওয়ায় বা তার পদ থেকে এইভাবে তাকে ব্যবহারে কোনও অসুবিধা হওয়ায় তাকে অপসারণ করার ক্ষেত্রে তৈরি

করার জন্যই তদন্ত সংস্থার প্রধান আবদুল মতিনের বিরুদ্ধে ছাত্রসংঘের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে।'

মতিনের পক্ষে সাফাইপ্রদানকারী আইনপ্রতিমন্ত্রীকেও এই প্রতিবেদনে উদ্ধৃত করা হয়েছে— 'সরকারের চারপাশের অতি উৎসাহী ব্যক্তিরা যেখানে চাইছেন, তদন্ত সংস্থার প্রধান পদত্যাগ করে তাদের নীলনকশা বাস্তবায়নকে সহজ করে দেবেন, কিন্তু আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বলছেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেছেন, 'ভাসা ভাসা ও ভূয়া কোন অভিযোগের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়।' তার মতে, 'তদন্ত সংস্থার প্রধান খুব নিরীহ, সৎ ও সোজা মানুষ।'

'দৈনিক সংগ্রাম-এর প্রতিবেদনের সারকথা হচ্ছে আবদুল মতিন তদন্তসংস্থার প্রধান থাকলে ট্রাইবুনালটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় এই ট্রাইবুনাল 'দেশে-বিদেশে কোথাও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।' (দৈনিক সংগ্রাম, ৪ মে ২০১০)

৩০ এপ্রিলের গোলটেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিদেশে মিশনগুলোকে ভালভাবে সক্রিয় করা হয়নি। (প্রাগুক্ত) এ বিষয়ে আমরাও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। গত ৭ এপ্রিল ইউরোপ ও আমেরিকা সফর শেষে দেশে ফিরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপুমনিকে জানিয়েছি— গত বছর সরকার '৭৩-এর আইনের যে আটটি সংশোধনী সংসদে অনুমোদন করেছে সংশোধিত সেই আইনটি এখনও আমাদের দূতাবাসগুলোয় পৌঁছোয়নি। যার ফলে বিদেশে অবস্থানরত যুদ্ধাপরাধীদের আত্মীয়-স্বজনদের প্ররোচনায় 'ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশন' সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ব্যক্তি '৭৩-এর আইনের যে সব সীমাবদ্ধতার কথা বলে পানি ঘোলা করতে চাইছে সরকারিভাবে তার উপযুক্ত জবাব দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ট্রাইবুনাল বা আইন মন্ত্রণালয় এখনও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলে নি মামলার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারি/বেসরকারি আর্কাইভে রক্ষিত কোন ধরনের তথ্য প্রমাণ প্রয়োজন এবং কোন প্রক্রিয়ায় তা সংগৃহীত হবে।

আমরা প্রথম থেকে বলছি ট্রাইবুনালের বিচারক, আইনজীবী ও তদন্ত সংস্থা সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সাক্ষীদের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। অর্থ মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও ট্রাইবুনালের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, পরিবহন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়নি। মন্ত্রণালয়গুলো এসব ব্যর্থতার জন্য একে অপরকে দায়ী করছে। জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি এসব মন্ত্রণালয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকেন, যদি তাদের দ্রুত অপসারণ না করা হয়, তাহলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়হীনতা, দায়সারা মনোভাব ও দায়িত্বহীনতা অব্যাহত থাকবে এবং জামায়াত যুদ্ধাপরাধীদের অভিপ্রায় অনুযায়ী সদ্যগঠিত ট্রাইবুনালে বিচারের নামে আমাদের একটি প্রহসন দেখতে হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারিক কার্যক্রমের যে কোনও স্তরে যে কোনও ধরনের ব্যর্থতা মহাজোট সরকারের

আন্তরিকতাকে শুধু প্রশ্নবিদ্ধ করবে না, আগামী নির্বাচনে এর ভয়ঙ্কর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

আমরা গত এক বছর ধরে বলছি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য জামায়াত এবং তাদের দেশী-বিদেশী সহযোগীরা দেশে ও বিদেশে বহুমাত্রিক তৎপরতা চালাচ্ছে। জামায়াত জানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় বাংলাদেশে তাদের অস্তিত্ব বিপণ্ন হবে। ট্রাইবুনালে যদি '৭১-এর গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী হত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধের দায়ে দল হিসেবে জামায়াতের বিচার সম্ভব নাও হয়, '৭২-এর সংবিধান কার্যকর হলে সাংবিধানিকভাবেই জামায়াত নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। জামায়াতের আন্তর্জাতিক মুরুব্বিরা তখন মরা ঘোড়ার উপর বাজি ধরবে কিনা এ নিয়ে দলের ভেতর জল্পনার ছিটেফোঁটা আমাদের কানেও আসছে। জামায়াতের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে তাদের পরীক্ষিত মিত্র বিএনপিও বেকায়দায় পড়বে। এ জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য জামায়াতের সঙ্গে বিএনপিও সমানভাবে সক্রিয়। কথায় কথায় বিএনপির মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ারের দাঁতখিচুনি সহ সরকার পতনের আন্দোলনের হুমকি জামায়াত-বিএনপির মরণদশার চরম অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়।

জামায়াতের ছত্রছায়ায় ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে শতাধিক জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। গত পনের মাসে গ্রেফতারকৃত দেশী-বিদেশী এসব জঙ্গী সংগঠনের নেতারা কবুল করেছে কীভাবে তারা হত্যা ও বোমা হামলা সহ বিভিন্ন ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের ভেতর জামায়াত এবং তাদের সহযোগীদের রাষ্ট্র ও জাতিবিরোধী এসব ষড়যন্ত্র একা সরকারের পক্ষে মোকাবেলা সম্ভব নয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক শক্তি ও সচেতন নাগরিক সমাজকে ঐক্যদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে জানিয়ে দিয়েছেন তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর '৭২-এর সংবিধানের পুনঃপ্রবর্তন চান। এ ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভেতর যে সমন্বয়হীনতার উল্লেখ করেছি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর একই ধরনের সমন্বয়হীনতা ও দূরত্ব রয়েছে, যা শহীদজননী জাহানারা ইমাম অপসারণ করেছিলেন আমাদের আন্দোলনের সূচনাপর্বে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি-নির্ধারকদের মনে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিচার শুধু সরকার বা আওয়ামী লীগের নিজস্ব বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বিজয় বা সাফল্য অর্জিত হবে না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দল এবং সচেতন নাগরিক সমাজের সামনে '৭১-এর ঘাতক-দালাল-যুদ্ধাপরাধী-মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক অপশক্তির সকল ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের বিকল্প কিছু নেই। প্রতিরোধ কর্মসূচি ছড়িয়ে দিতে হবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণকে বিচারিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

ট্রাইবুনালে শুধু কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে না। ব্যক্তির অপরাধের পাশাপাশি যে রাজনীতি গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, এসব অপরাধকে মহিমান্বিত করেছে সেই রাজনীতিকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। ব্যক্তি ও রাজনীতির বিচারের পাশাপাশি এই সব অপরাধের ব্যাপকতা ও ভয়বহতা দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। এ কাজ করতে হলে শক্তিশালী ট্রাইবুনালের পাশাপাশি গোটা জাতিকে অবশ্যই '৭১-এর চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ক্ষমতার বাইরে থাকলে আওয়ামী লীগ যতটা জনগণের কাছে থাকে, ক্ষমতায় গেলে ততটাই দূরে সরে যায়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী অন্যান্য রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ সচেতন নাগরিক সমাজের। সরকারের যে কোনও গণবিরোধী কাজের সমালোচনা আমরা যেমন করব একইভাবে '৭২-এর সংবিধানের পুনঃপ্রবর্তন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা।

আমরা জানি রাজনৈতিক দলসমূহের নির্দিষ্ট দর্শন রয়েছে, রাজনৈতিক মত ও পথের পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্নে, '৭২-এর সংবিধানে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত রাষ্ট্রের চার মূলনীতির প্রশ্নে এবং যুদ্ধাপরাধীদের সুষ্ঠু বিচারের প্রশ্নে কোনও মতপার্থক্য থাকা উচিৎ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনে বর্তমান মহাজোট সরকার যদি ব্যর্থ হয় ২০১৪ সালে অনুষ্ঠেয় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই ব্যর্থতা দেশ ও জাতির জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনবে।

৪ মে ২০১০

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের বহুমাত্রিক চক্রান্ত

শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১৯৯২-এর জানুয়ারিতে আমরা যখন প্রথম সংগঠিতভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করি তখনই '৭১-এর ঘাতক-দালাল যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে আমরা নাকি ভারতের দালাল, ঠিক যেমনটি তারা বলত '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী আওয়ামী লীগকে। জামায়াত আরও বলেছে— যুদ্ধাপরাধী বলে দেশে নাকি কেউ নেই, জামায়াতের কেউ নাকি যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয়, বঙ্গবন্ধু নাকি যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন— ইত্যাদি।

গত দেড় যুগেরও অধিককাল জামায়াতের '৭১-এর ভূমিকা আমরা জনগণের সামনে তুলে ধরেছি, তৃণমূল থেকে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন যাবতীয় দুষ্কর্মের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে গ্রন্থকারে প্রকাশ করেছি, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছি, কর্মশালা, শোভাযাত্রা, সমাবেশ প্রভৃতি আয়োজন করেছি; জামায়াতীদের এলাকায় পাঠাগার স্থাপন করেছি এবং এভাবেই জামায়াতের প্রকৃত চেহারা দেশবাসী— বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। আমাদের এসব তৎপরতা শুধু রাজধানীতে নয়, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল অবধি বিস্তৃত। একই সঙ্গে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির তৎপরতা বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ১২টি দেশে আমাদের শাখা রয়েছে।

আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে জামায়াত যেসব অপপ্রচার করেছে, যেসব প্রশ্ন তুলেছে— দেশবাসী যে তা প্রত্যাখ্যান করেছে তার প্রমাণ হচ্ছে ২০০৮-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই ইতিহাসসৃষ্টিকারী নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট জাতীয় সংসদের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে জয়ী হয়েছে, শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে খালেদা-নিজামীর নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের। গত নির্বাচনে জামায়াতের একজন যুদ্ধাপরাধীও নির্বাচিত হতে পারেনি অথচ এর আগের নির্বাচনে বিএনপির বদৌলতে জামায়াতের ডজন খানেক যুদ্ধাপরাধী জাতীয় সংসদের আসন কলংকিত করেছে, যাদের দুজনকে খালেদা জিয়া মন্ত্রী পর্যন্ত বানিয়েছিলেন।

২০০৯ সালে জানুয়ারিতে মহাজোট ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এই বিজয়ের জন্য আমাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, বহু চড়াই-উৎরাই পেরুতে হয়েছে, আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন, চাকুরিচ্যুতি, মিথ্যা মামলা সহ বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। শহীদজননী জাহানারা ইমাম ও কবি সুফিয়া কামাল থেকে আরম্ভ করে বিচারপতি কে এম সোবহান পর্যন্ত বহু নেতাকে

আমরা হারিয়েছি, তারপরও এই আন্দোলন থেমে থাকেনি। সত্যকে কখনও প্রতিহত করা যায় না। কিছু সময়ের জন্য মিথ্যার কালোমেঘ সত্যকে আচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু সত্য সব সময় আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়।

২০০৯ সালে বর্তমান মহাজোট সরকার যখন থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদোগ গ্রহণ করেছে তখন থেকে '৭১-এর ঘাতক-দালাল-যুদ্ধাপরাধীদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে, পায়ের তলার মাটিতে ধ্বস নেমেছে। গত এক বছরে জামায়াতের বহু কর্মী দলত্যাগ ও দেশত্যাগ করেছে। ধ্বংস অনিবার্য জেনে জামায়াত তখন উন্মাদের মতো আচরণ করছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য জামায়াত তাদের দেশী-বিদেশী মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে বহুমাত্রিক তৎপরতা চালাচ্ছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক প্রণীত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন ১৯৭৩'- অনুযায়ী বিশেষ ট্রাইবুনালে। এই আইনে অপরাধের সংজ্ঞা, বিচার পদ্ধতি, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ও শাস্তি সম্পর্কে সবই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি, জাপান ও ফিলিপাইন সহ বহু দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে। এই সব ট্রাইবুনালে কখনও প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি। প্রচলিত ফৌজদারি আইনে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও গণহত্যার বিচার সম্ভব নয় বলেই জার্মানির নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় নুরেমবার্গের বিশেষ আদালতে বিশেষ নীতি ও বিধান প্রণীত হয়েছিল। বাংলাদেশের '৭৩-এর আইন অতীতের এসব নীতি ও বিধানের নির্যাস গ্রহণ করে ঋদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের আগে পৃথিবীর কোন দেশ গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজস্ব আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি।

নুরেমবার্গ বা টোকিও ট্রাইবুনালের জন্য প্রণীত নীতি ও বিধানের চেয়ে বাংলাদেশের 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন' যে অনেক উন্নতমানের এ কথা আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বহু খ্যাতনামা আইনজ্ঞ স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের সেরা আইনজ্ঞরা সহ নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালের সঙ্গে যুক্ত আইনজীবীরা এবং ভারতের দুজন শীর্ষস্থানীয় আইনজ্ঞ এই আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছেন যেটি আমাদের সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া বিঘ্নিত করার জন্য জামায়াত ও বিএনপির আইনজীবীরা '৭৩-এর আইন সম্পর্কে, অপরাধের সংজ্ঞা সম্পর্কে অদ্ভুত সব প্রশ্ন তুলেছেন। সম্প্রতি তারা বলছেন সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলে ক্ষমতায় এসে এখন বলছে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার করবে। তারা বিভিন্ন সেমিনারে বা গণমাধ্যমে এমনভাবে বিষয়টি উত্থাপন করছেন যেন যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। '৭৩-এর আইনে এসব অপরাধের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা এতদসংক্রান্ত যাবতীয় আন্তর্জাতিক আইন সম্মত। আমাদের আইনজ্ঞরা '৭৩-এর আইনে যেভাবে এসব অপরাধের সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সঙ্গে প্রচুর মিল রয়েছে ২০০২ সালে গৃহীত রোমের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আইনের।

বাংলাদেশে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গত ১৮ বছর ধরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলছে। '৭৩-এর আইনে 'যুদ্ধাপরাধ', 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ', 'শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ', 'গণহত্যা' প্রভৃতির পৃথক সংজ্ঞা দেয়া আছে। তবে সাধারণভাবে আমরা বলি যুদ্ধাপরাধ, অর্থাৎ যুদ্ধাকালীন সময়ে সংঘটিত হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, গৃহে অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, ও লুণ্ঠন সহ মানবতাবিরোধী যাবতীয় অপরাধ। বাংলাদেশে 'রাজাকার' বলতে শুধু মুক্তিযুদ্ধকালে জামায়াত কর্তৃক গঠিত রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের বোঝায় না; সকল স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিকেই রাজাকার বলা হয়। জনপ্রিয় কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের একটি টেলিভিশন সিরিয়ালে 'তুই রাজাকার' বলে এটিকে স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদীদের সমার্থক শব্দে পরিণত করা হয়েছে। একইভাবে 'যুদ্ধাপরাধী' বলতে আমরা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ ঘাতক, দালাল, রাজাকার, আলবদর সবাইকে বুঝি।

জামায়াতের নেতারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধিতা করতে গিয়ে গত কয়েক বছর ধরে যে সব প্রলাপোক্তি করছেন তাতে বার বার সেই বাংলা প্রবাদটির কথা মনে হয়— 'ঠাকুরঘরে কে? আমি কলা খাই না!' জামায়াতের নেতারা একবার বলেন, '৭১-এ বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের কোনও ঘটনা ঘটেনি। আবার বলেন, জামায়াত যুদ্ধাপরাধ করেনি। কখনও বলেন, জামায়াতকে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধাপরাধের বিচার করা হচ্ছে। কখনও বলেন, ইসলাম ধ্বংসের জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হচ্ছে এবং এটা ভারতের ষড়যন্ত্র। জামায়াত '৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতীয় ষড়যন্ত্র বলেছে। তাদের পাকিস্তানি প্রভুরা '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির সকল আন্দোলন-সংগ্রামকে ভারতের ষড়যন্ত্র বলেছে। বাংলাদেশের মানুষ যদি তা বিশ্বাস করত তাহলে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে কিংবা ২০০৯-এর ভোটযুদ্ধে পাকিস্তান এবং তাদের এদেশীয় খেদমতগারদের এত শোচনীয় পরাজয় ঘটত না।

জামায়াতপ্রধান মতিউর রহমান নিজামী সম্প্রতি জামায়াতের জেলা আমীরদের এক সমাবেশে বলেছেন জামায়াতের নেতারা '৭১-এ যুদ্ধাপরাধ করেননি, তারা শুধু পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য কাজ করেছেন। নিজামীর এলাকার ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে বলেছেন পাকিস্তান রক্ষার জন্য তিনি '৭১-এ কীভাবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হত্যা-নির্যাতন-লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যার কিছু অংশ আমার প্রামাণ্যচিত্র 'যুদ্ধাপরাধ ৭১'-এ বিধৃত হয়েছে। ট্রাইবুনালই বলবে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজামীদের পাকিস্তান রক্ষার তৎপরতা কোন ধরনের অপরাধ।

জামায়াতের কোন নেতা যদি '৭১-এ কোন অপরাধ না করে থাকেন তাহলে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধিতা কেন করছেন? কেন বলছেন বিচার আরম্ভ হলে এর পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে, দেশ অচল করে দেয়া হবে? তারা যদি সত্যিকার অর্থেই কোন অপরাধ না করে থাকেন তাদের উচিৎ এই বিচারকে স্বাগত জানানো। একজন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার সাধ্য কোন আদালতের নেই। নবগঠিত আন্তর্জাতিক

অপরাধ ট্রাইবুনালে অভিযুক্তরা আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ পাবেন, আদালতের রায় তাদের পছন্দ না হলে সুপ্রিম কোর্টে তারা আপিল করতে পারবেন। বিচার ঠিকমতো হচ্ছে কি না তা প্রত্যক্ষ করার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত পর্যবেক্ষক আসবেন। এদের সামনে একজন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে কীভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয়া হবে এটা আমাদের বোধগম্যের অতীত।

হালে জামায়াতের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে বিএনপি। দুই দল কোরাসে বলছে সরকার বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাসের সমস্যার সমাধান না করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করছে! বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসের সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধ কোথায় আমরা জানি না। তাদের কথা শুনে মনে হতে পারে পিডিবি, ওয়াসা বা তিতাস গ্যাস বুঝি তাদের কাজ বাদ দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে! নাকি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের বিচারক ও আইনজীবীরা এতদিন বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন! আমজনতার কাছে বিদ্যুৎ যেমন জরুরি, বিচারও জরুরি। যে ট্রাইবুনাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সহ জনজীবনের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তাদের নয়। তবে পিডিবি, ডেসা বা ওয়াসায় যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কেউ থাকতেই পারেন। তারা অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন কিনা এটা তদন্ত করে দেখা দরকার।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জামায়াত তাদের পাকিস্তানি প্রভুদের সহযোগিতা পাচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পাকিস্তান বলছে '৭১-এ পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে কোন গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ করেনি, বরং বাঙালিরা পাকিস্তানিদের, বিশেষভাবে অবাঙালি বিহারিদের হত্যা করেছে। এসব কাজে ক্ষেত্র বিশেষে পাকিস্তান কোথাও বিপুল অর্থের বিনিময়ে প্রবাসী ভারতীয়দেরও ব্যবহার করেছে। শর্মিলা বসু নামে জনৈক আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়, বছর দুই আগে লিখেছেন '৭১-এ পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা বাঙালি নারী নির্যাতনের অভিযোগ নাকি নির্জলা মিথ্যা, বরং বাঙালিরা যে অবাঙালি নারীদের নির্যাতন করেছে তার নাকি অনেক প্রমাণ আছে। সরকারি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকালে নির্যাতিত নারীদের সংখ্যা দুই লাখ, বেসরকারি হিসেবে চার লাখেরও বেশি। এই দাবি কোন বাঙালির নয়, অস্ট্রেলীয় চিকিৎসক জিফ্রি ভেডিসের, যিনি '৭২-এর জানুয়ারিতে রেডক্রসের চিকিৎসক দলের সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য। তাদের দল এবং বিভিন্ন হাসপাতালে আমাদের চিকিৎসকরা '৭২-এর প্রথম তিন মাসে দেড় লাখ নারীর গর্ভাপাত করেছিল। লন্ডনে ফিরে গিয়ে ডাঃ ডেভিস বলেছিলেন, '৭১-এ নির্যাতিত নারীদের সংখ্যা চার লাখেরও বেশি। অথচ গবেষক শর্মিলা বসু তাদের একজনকেও নাকি খুঁজে পাননি!

সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকা সফরের সময় দেখেছি জামায়াতিদের প্ররোচনায়, নাকি পাকিস্তানিদের অর্থের বিনিময়ে (!) আইনজীবীদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশন' ধুয়া তুলেছে— '৭৩-এর আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা যাবে না। তারা এই আইনের অনেকগুলো সংশোধনীর প্রস্তাব করেছে।

আমাদের ট্রাইবুনালে তিনজন বিচারপতিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। 'আইবিএ' বলছে, ট্রাইবুনালের বিচারপতি নাকি অভিযুক্তের পছন্দের হতে হবে এবং তিনজন বিচারপতি একমত না হলে নাকি রায় দেয়া যাবে না। পৃথিবীর কোন দেশে এমন অসম্ভব, উদ্ভট বিচার ব্যবস্থা আছে আমাদের জানা নেই, তবে আইবিএ এবং তাদের তল্পিবাহকদের মতে এসব সংশোধনী না করা হলে এই বিচার নাকি তাদের গ্রহণযোগ্য হবে না।

আইবিএ-র সুপারিশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্ব পাবে না, কারণ উকিলরা সব সময় মক্কেলের স্বার্থই দেখবে। যুদ্ধাপরাধীরা যদি আইবিএ-র মক্কেল হয় তাহলে এমন উদ্ভট দাবি তারা করতে পারে বৈকি। বিষয়টি উল্লেখ করছি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের উদ্দেশ্যে জামায়াত এবং তাদের পাকিস্তানি প্রভুদের বহুমাত্রিক তৎপরতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা প্রদানের জন্য। তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে, বৃটিশ পার্লামেন্টে, আমেরিকান কংগ্রেসে এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থায়। ধর্না দিচ্ছে জাতিসংঘের সামনে, হুমকি দিচ্ছে সৌদি আরবে কর্মরত বাঙালি শ্রমিকদের ফেরত পাঠাবার; দেশের ভেতরে নাশকতামূলক কাজের জন্য সংগঠিত করছে জঙ্গী মৌলবাদীদের। জামায়াত ও তাদের প্রভুদের এসব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করতে হবে। জাতিকে মুক্ত করতে হবে প্রায় চার দশকের বিচারহীনতার অভিশাপ থেকে।

২০ এপ্রিল ২০১০

মন্ত্রীদের অজ্ঞতা এবং আমাদের বিড়ম্বনা

মুক্তিযুদ্ধের ৩৯ বছর পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ যেমন যুগান্তকারী ঘটনা একইভাবে এত বছর পর মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা জানানোর উদ্যোগও কম প্রশংসনীয় নয়। এ বিষয়ে 'কালের কণ্ঠে' প্রকাশিত একটি সংবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতে বলা হয়েছে— 'মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথমবারের মতো সরকার ১৪ ভারতীয় ও চার পাকিস্তানিসহ ৩৩ বিদেশি নাগরিক এবং একটি সংগঠনকে সম্মাননা দেবে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের সম্মাননা জানাবেন। এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এ বি এম তাজুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধে সাহায্য ও সহযোগিতার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই সম্মাননা জানানো হবে। তিনি আরো বলেন, ৩৯ বছরেও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য কোনো বিদেশি নাগরিককে সম্মাননা জানানো হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার এই প্রথমবারের মতো এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী জানান, এ পর্যন্ত যেসব নাম পাওয়া গেছে এবার তাঁদেরই সম্মাননা জানানো হচ্ছে। পরে আরো নাম পেলে তাঁদেরও সম্মাননা জানানো হবে।

'... বিশেষ সম্মাননা পেতে যাচ্ছেন যেসব বিদেশি নাগরিক তাঁরা হলেন— ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, শ্রী জগজ্জীবন রাম, ফিল্ড মার্শাল এস এ মানিকশ, লে জে জগজিৎ সিং অরোরা, জয়প্রকাশ নারায়ণ, গোবিন্দ হালদার, জেনারেল রুস্তমজী (মুক্তিযুদ্ধকালীন বিএসএফ প্রধান), ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে (বিএসএফ), ব্রিগেডিয়ার গোলক মজুমদার (বিএসএফ), সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শহীদ অরুণ ক্ষেত্রপাল, সিপাহি শহীদ আলবার্ট এক্কা, ফ্লাইং অফিসার শহীদ এনজেএস সিখান, ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরী এবং শ্রী সমর সেন। পাকিস্তানি নাগরিকদের মধ্যে যাঁরা সম্মাননা পেতে যাচ্ছেন, তাঁরা হলেন আসমা জাহাঙ্গীর (মানবাধিকার কর্মী), কবি আহমেদ সেলিম, তাহেরা মাজহার আলী ও এয়ার মার্শাল আজগর খান। যুক্তরাষ্ট্রের যাঁরা সম্মাননা পেতে যাচ্ছেন, তাঁরা হলেন এডওয়ার্ড কেনেডি, আর্চার কে ব্লাড, ডা. রোনাল্ড জোসেফ, পণ্ডিত রবি শংকর, জর্জ হ্যারিসন, জোয়ান বয়েজ, সিনেটর ফ্র্যাঙ্ক চার্চ ও সিনেটর স্যাক্সবি। এ ছাড়াও কিন টেন ওরুট বাগে (নেদারল্যান্ডস), প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান, এল আই ব্রেজনেভ (রাশিয়া), নিকোলাই পদগর্নি (রাশিয়া), ব্রুক ডগলাস (যুক্তরাজ্যের তৎকালীন লেবার পার্টির নেতা), রাসেল জনস্টন (যুক্তরাজ্য), সায়মন ড্রিংককে (যুক্তরাজ্য) সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। সংগঠন হিসেবে সম্মাননা পাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব জুরিস্ট (জেনেভা)।' (কালের কণ্ঠ, ১৫ মার্চ ২০১০)

গত চোদ্দ মাস ধরে লক্ষ্য করছি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার অনেক মহৎ কর্ম সম্পাদনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেও নীতিনির্ধারকদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে অন্তিমে তা পর্বতের মুষিক প্রসবের মতো দাঁড়াচ্ছে। যেমন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার মহাজোট সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার শুধু নয়, জনগণ মহাজোটকে প্রধানতঃ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের জন্যই বিপুল ভোটে বিজয়ী করে ক্ষমতায় এনেছে। ১৩ বছর ঝুলে থাকা বঙ্গবন্ধু হত্যার একটি দায়সারা তদন্ত করে আত্মঘোষিত কয়েকজনকে বিচার করে শাস্তি দেয়া হলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারের অকারণ কালক্ষেপণ, নীতিনির্ধারকদের নানাবিধ নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত উক্তি অবিরাম শ্রবণ করতে গিয়ে আমরা যারপরনাই ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করছি। গত সপ্তাহে যেমন মহাজোট সরকারের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী বললেন— সরকার নাকি হাজার হাজার যুদ্ধাপরাধীর বিচার করবে না, দু একজনের বিচার করবে এবং তাও নাকি প্রতীকী!

মন্ত্রীর এ হেন বক্তব্য পত্রিকায় দেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছে, এসব কী শুনছি? টেলিভিশনের কয়েকটি 'টক শো'-তেও বার বার বলতে হয়েছে— '৭৩-এর 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন' সম্পর্কে কিংবা 'প্রতীকী বিচার' সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর অজ্ঞতা সম্পর্কে। যুদ্ধাপরাধীদের 'প্রতীকী বিচার' অভিনব কোন বিষয় নয়। যেমন ১৯৬৭ সালে বরেণ্য ফরাসী লেখক জাঁ পল সার্ত্র এবং বৃটিশ মনীষী বার্টার্ন্ড রাসেল ভিয়েতনাম যুদ্ধে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য আমেরিকাকে দায়ী করে প্যারিসে গণআদালত বসিয়ে এর বিচার করেছিলেন। তাঁদের পথ অনুসরণ করে আমরা শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১৯৯২-এর ২৬ মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালত বসিয়ে '৭১-এর শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত জামায়াত নেতা গোলাম আযমের বিচার করেছিলাম। ইরাক যুদ্ধে আমেরিকাকে যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী করে খোদ আমেরিকার প্রাক্তন এ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামজে ক্লার্ক দুটো গণআদালতের আয়োজন করেছিলেন। এগুলোই প্রতীকী বিচার— যা সরকার নয়, সচেতন নাগরিকরা করেন যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধীদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন এবং তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার গণহত্যাকারী, যুদ্ধাপরাধী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী এবং শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধীদের বিচারের জন্য যে অনন্যসাধারণ আইন প্রণয়ন করেছেন সেখানে প্রতীকী বিচারের কোন সুযোগ নেই। অপরাধ প্রমাণ হলে এই আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধানও রয়েছে। এই আইনের অধীনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যে ট্রাইবুনাল গঠিত হবে— সেটি সম্পূর্ণ স্বাধীন। সরকার কখনও বলতে পারে না দু'এক জন, না দু'একশ জন অথবা দু'এক হাজার জনের বিচার হবে। কতজনের বিচার কতদিনে হবে এবং কীভাবে হবে— সব কিছু নির্ধারণের এখতিয়ার ট্রাইবুনালের, অন্য কারও নয়। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

এদের যে কারও স্বজন তথ্যপ্রমাণসহ যদি বিচারের জন্য ট্রাইবুনালের শরণাপন্ন হন, তাকে বিচারপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করার এখতিয়ার সরকারের নেই। এটা ভিকটিমের শুধু সাংবিধানিক অধিকার নয়, ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন এবং সভ্যতার বোধ সংরক্ষণের বিষয়টি এর সঙ্গে জড়িত।

আমাদের আইন প্রতিমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, সরকারের অনভিজ্ঞতার কারণে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বিলম্ব ঘটছে। অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতা কোনও অপরাধ নয়, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর করা যায়। তবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা যদি কোন অবদান রাখে তা শুধু সরকারের সদিচ্ছাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে না— সমগ্র জাতির জন্য সমূহ বিড়ম্বনা ও বিপর্যয় ডেকে আনবে।

এ ক্ষেত্রে আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা জ্ঞাপনের বিষয়টি আনতে পারি। সংস্কৃতি মন্ত্রী যেদিন জাতীয় সংসদে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং সংসদ সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেন তার পরদিনই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন তাজকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। এ বিষয়টি ১৯৯৭ সালে মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী উদযাপনের প্রাক্কালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের নিকট আমরা উত্থাপন করেছিলাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান অনেকে রেখেছেন। প্রতিবেশী ভারতসহ বিভিন্ন দেশের জনগণের অবদানের কথা যদি বলি তাহলে বহু কোটি মানুষের কথা স্মরণ করতে হবে। তখন প্রতীকী অর্থে ১০০ জনের তালিকা প্রস্তুত করে আমরা প্রধানমন্ত্রীর দফতরে দিয়েছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম, রজতজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবর্ধনার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্মানিত নাগরিকের মর্যাদা প্রদানের জন্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ফিল্ড মার্শাল মানেকশ, ও জেনারেল অরোরার নামে রাজধানীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নামকরণের প্রস্তাবও করেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রস্তাব অনেকেই করেছেন। তখন আওয়ামী লীগ সরকার আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও ৩৯ বছর পর এই জরুরি কাজটি করতে যাচ্ছে এতে আমরা নিঃসন্দেহে আনন্দিত।

তবে সমস্যা হচ্ছে কীভাবে এ কাজটি হবে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে কি অন্য সবার মতোই একটি সম্মাননাপত্র দেয়া হবে? কলকাতায় যদি বঙ্গবন্ধুর নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক থাকতে পারে, ঢাকায় কেন ইন্দিরা গান্ধী সরণি থাকবে না এ প্রশ্নের জবাব সংবর্ধনার উদ্যোক্তা মাননীয় মুক্তিযোদ্ধা প্রতিমন্ত্রীর জানা থাকতে হবে।

যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষেত্রে আমরা যেমন 'প্রতীকী বিচার'-এর তামাশা দেখতে চাই না তেমনি মুক্তিযুদ্ধের বিদেশী বন্ধুদের সংবর্ধনার ক্ষেত্রেও অজ্ঞতাজনিত কোনও সিদ্ধান্ত সরকার ও জাতির জন্য বিব্রতকর হোক এটা আমরা চাইতে পারি না। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী 'কালের কণ্ঠ'কে বলেছেন, যাদের নাম পেয়েছেন তাদের ভেতর থেকে নাকি প্রথম দফায় ৩৩ জনকে বাছাই করেছেন। এই তালিকা তাঁকে কারা দিয়েছেন আমি জানি না, তবে এ বিষয়ে আমরা যারা কাজ করছি— অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন,

সাংবাদিক সালাম আজাদ, কলামিস্ট মোনায়েম সরকার কিংবা এই অধম লেখক যে দিইনি এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। তালিকা দেখে মনে হয়েছে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আওয়ামী লীগের আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ কিংবা তাঁরই সহযোগী অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, জাতীয় সংসদের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জোহরা তাজউদ্দিন সহ মহাজোটের শীর্ষ নেতাদের কারও সঙ্গেই পরামর্শ করেননি।

ভারতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে অরোরা, মানেকশ'র নাম নিশ্চয়ই আসবে। তবে সেই সময় মুজিবনগর সরকারে যারা ছিলেন তাঁরা জানেন শ্রীমতি গান্ধীর উপদেষ্টা ডিপি ধর, পিএন হাকসার, পররাষ্ট্র সচিব টিএন কল ও পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের অবদান মুক্তিযুদ্ধে কতটুকু। এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে ভাল বলতে পারবেন প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম উপদেষ্টা মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীপরিষদ সচিব এইচ টি ইমাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রীসভার দুজন সদস্য— করণ সিং ও আইকে গুজরাল এখনও বেঁচে আছেন। ক'দিন আগেই করণ সিং ঢাকা এসেছিলেন। ভারতীয় দূতাবাসের নৈশভোজে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপুমণি সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গেই ছিলেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কষ্ট করে যে নামগুলো সংগ্রহ করেছেন তাঁদের সম্পর্কেও যথেষ্ট জানেন বলে মনে হয় না। ভারতের বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক রুস্তমজীর নামের আগে জেনারেল বসানো হয়েছে। বিএসএফ-এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান গোলক মজুমদারের নামের সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার লাগানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধে এঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন এবং দুজনেরই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধারনের সুযোগ হয়েছিল আমার। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এঁরা দুজনেই ভারতের পুলিস সার্ভিসের ক্যাডার, কস্মিনকালেও সামরিক বাহিনীতে ছিলেন না, তাই এঁদের জেনারেল বা ব্রিগেডিয়ার হওয়ার হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ৩৩ জনের তালিকায় যুক্তিসঙ্গত কারণে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের নাম আছে, কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং এবং অর্থমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যাবনের নাম নেই। কোন বিবেচনায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরিকে প্রথম তালিকায় রাখা হয়নি এর জবাব তাঁর নিশ্চয়ই জানা আছে।

ক্যাপ্টেন তাজ জানতে না পারেন আমাদের পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার কিংবা অন্য সেক্টর কমান্ডাররা নিশ্চয়ই একবাক্যে বলবেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেল সরকারের বিশাল অবদানের কথা। আবদুর রাজ্জাকরা বলতে পারবেন জেনারেল উবানের অবদানের কথা। সেই সময় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডে যারা ছিলেন তাদের কথা আমাদের সেক্টর কমান্ডাররা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। এদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার আমি গ্রহণ করেছিলাম আজ থেকে ১৪-১৫ বছর আগে। এদের ভেতর জেনারেল জ্যাকব, জেনারেল থাপান,

জেনারেল লছমন সিং-এর কথা আমরা ভুলে যেতে পারি না। ভুলতে পারি না জেনারেল সগৎ সিং ও জেনারেল গন্ধর্ব নাগরার কথা। আমাদের দুই মন্ত্রী মতিয়া আপা ও নাহিদ ভাই জানেন মুক্তিযুদ্ধে সিপিআই-এর নেতাদের অবদানের কথা। এস এ ডাঙ্গে ও রাজেশ্বর রাও থেকে আরম্ভ করে রমেন মিত্র, ইলা মিত্র, ভুপেশ গুপ্ত, নিখিল চক্রবর্তী, গীতা মুখার্জী, শান্তিময় রায়, ভবানী সেন, বিশ্বনাথ মুখার্জী ও স্বাধীন গুহর মতো সিপিআই নেতারা কার্যত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। মহাজোটের অন্যতম নেতা ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন নিশ্চয়ই জানেন সিপিএম-এর জ্যোতি বসু ও এ কে গোপালনের কথা। ভারতের কথাশিল্পী দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওয়াহিদুল হক আখ্যায়িত করেছিলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে।

মাত্র দেড় মাস আগে কলকাতার মৃন্ময়ী বোসের কাজে জেনেছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কিংবদন্তীর কণ্ঠশিল্পী লতা মুঙ্গেশকর, মান্না দে, সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরী ও চিত্রনির্মাতা বিমল রায়ের অবদানের কথা। কবি কাইফী আজমী, শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন ও অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমানের অবদানের কথা আমি অনেক আগে লিখেছি। কলকাতার মৈত্রেয়ী দেবী, জাস্টিস মাসুদ, দীলিপ চক্রবর্তী, উৎপলা মিশ্র, জন হেস্টিংস, সুকুমার বোস, সমর গুহ, ড. ত্রিগুণা সেন, বহরমপুরের ইপ্সিতা গুহ, শিলঙের অঞ্জলি লাহিড়ী, ত্রিপুরার ডাঃ সুজিত দে, অনিল ভট্টাচার্য— কাকে বাদ দিয়ে কার কথা বলব। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর ঋত্বিক ঘটক, এস শুকদেব ও গীতা মেহতার অসাধারণ প্রামাণ্যচিত্রের কথা কি কখনও ভোলা যাবে? কিশোর পারেখের আলোকচিত্র এখনও ছাপা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে। এমন কোন মুক্তিযোদ্ধা কি আছেন— অংশুমান রায়ের 'শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে' কিংবা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'মাগো ভাবনা কেন' অথবা ভূপেন হাজারিকার 'জয় জয় জয় জয় বাংলাদেশ' শুনে উদ্দীপ্ত হননি? শিল্পী বাঁধন দাস তুলি ফেলে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন। চিত্র সমালোচক প্রণব রায় এবং তাঁর শিল্পী বন্ধুরা ছবি বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য। আকাশবাণীর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন আর উপেন তরফদারের অবদান ভুলে যাওয়া চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হবে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায় থেকে আরম্ভ করে ভারতের বরেণ্য লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের অবদানের কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলা যায়।

অর্থমন্ত্রী মুহিত ভাই নিশ্চয়ই বলতে পারবেন আমেরিকায় রিচার্ড টেইলরদের অবরোধের কথা। তাঁরা কীভাবে পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজকে শিকাগো বন্দর থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কীভাবে মার্কিন প্রশাসনের বাংলাদেশবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন জনমত সংগঠিত করেছেন এ নিয়ে 'ব্লকেড' নামে একটি বইও লেখা হয়েছে যেটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের সুযোগ্য পুত্র মেসবাহউদ্দিন মুনতাসীর। ক্যাপ্টেন তাজকে যারা তালিকা সরবরাহ করেছেন তারা কীভাবে ফরাসী মনীষী ও রাজনীতিবিদ আঁদ্রে মালরোর নামটি ভুলে গেলেন? জার্মানীর

চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ কিংবা মন্ত্রী পিটার শোরের অবদানের কথা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে বেশি কেউ না জানলেও আমরা যারা ইতিহাস নাড়াচাড়া করেছি তারা তো কিছুটা হলেও জানি।

তালিকায় জাতিসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি সমর সেনের নাম দেখে ভাল লেগেছে। কোন বিবেচনায় জাতিসঙ্ঘে সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক কিংবা প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকোর নাম বাদ যাবে? পাকিস্তানে আসগর খানের পাশাপাশি অতি অবশ্যই ওয়ালি খানের কথা বলতে হবে। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির শামিম আশরাফ মালিক, নাসিম আখতার, আফসান্দিয়া খটক কিংবা পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের নেতা মাস্টার খান গুলের কথা ভুলে গেলে চলবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে যে পাকিস্তানি নাগরিক প্রথম বাংলাদেশ সফর করেন তিনি পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক 'ডন' এর নির্বাহী সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক মাজহার আলী খান। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার উপর ধারাবাহিকভাবে ডন-এ লিখে চাকরি হারিয়েছিলেন তিনি। '৭১-এ ঢাকায় কমিশনার ছিলেন আলমদার রাজা যিনি পরে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণহত্যার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছিলেন। তার 'ঢাকায় ডিবাকল' গ্রন্থেও এই গণহত্যার হৃদয়বিদারক কিছু বিবরণ দিয়েছেন, যিনি আমাদের আমন্ত্রণে ২০০১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় সম্মেলনে এসেছিলেন। আলমদার রাজা এখন মৃত্যুশয্যায়, আসমা জাহাঙ্গীরের আগে তাঁকে সংবর্ধনা দেয়া উচিৎ। মুক্তিযুদ্ধের সময় আসমা কলেজ ছাত্রী ছিলেন, গণহত্যার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার পিতা বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা মালিক গোলাম জিলানী। আমরা কেন ভুলে যাচ্ছি পাকিস্তানের সাহসী সাংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসকারানহাসের কথা! সাংবাদিক সাইমন ড্রিং-এর পাশাপাশি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ভারতের সাংবাদিক মানস ঘোষ, হিরন্ময় কার্লেকার ও চাঁদ জোশীর নাম, যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর রিপোর্ট লেখার জন্য '৭১-এ সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন।

গত বছর কাঠমণ্ডুতে নেপালের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রামবরণ যাদবের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা বলেছেন। নেপালের পার্লামেন্টের প্রাক্তন স্পীকার দামান ধুঙ্গানা কিংবা নেপাল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের অবদানের কথা আমরা জানি। বাংলাদেশকে দ্বিতীয় কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানকারী রাষ্ট্র ভূটানের রাজাকে সম্মান জানাতে কেন আমাদের কার্পণ্য থাকবে? কেন প্রথম তালিকায় একমাত্র খেতাব প্রাপ্ত বিদেশী মুক্তিযোদ্ধা অস্ট্রেলিয়ার ডব্লুএএস ওডারল্যান্ড বীরপ্রতীকের নাম থাকবে না? ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পর বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে পোলান্ডের কথা উল্লেখ করেছিলেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন তাজ কি জানবার চেষ্টা করেছেন পোল্যান্ডের সরকারপ্রধান তখন কে ছিলেন? ১৪ জন নোবেল বিজয়ী '৭১-এ বাংলাদেশের গণহত্যার নিন্দা করে যে অসাধারণ বিবৃতি দিয়েছিলেন তাঁদের খুঁজে বের

করা কঠিন কোন কাজ নয়। হানা পাপানাক ও গুস্তাভ পাপানাকের অবদানের কথা তখনকার মার্কিন সংবাদপত্রেও পাওয়া যাবে।

শুরুতেই বলেছি মহাজোট সরকারের অনেক সাধু উদ্যোগ অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে উদ্যোক্তাদের অজ্ঞতার কারণে। মন্ত্রী হলেই সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে এমন কথা কেউ বলছে না। তবে যিনি যে কাজটি করবেন সে বিষয়ে তাঁর সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা না থাকলে অভিজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের মহান বিদেশী বন্ধুদের সংবর্ধনা নিঃসন্দেহে মহৎ উদ্যোগ। ভাল হয় স্বাধীনতার ৪০তম বার্ষিকীতে অন্ততপক্ষে শীর্ষস্থানীয় ১০০ জন বন্ধু বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যদি ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান। এতে বহির্বিশ্বে আমাদের মর্যাদা যেমন বাড়বে— দুঃসময়ের বন্ধুদেরও উপযুক্ত সম্মান জানানো হবে। তবে প্রথম ১০০ জনের তালিকায় কারা থাকবেন এটা মহাজোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেই ঠিক করতে হবে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রেও নীতি নির্ধারকদের এই অভিজ্ঞতার অভাব কখনও কখনও সমূহ উদ্বেগ ও আতঙ্কের কারণ হচ্ছে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে সম্ভাব্য তদন্ত কর্মকর্তা বা আইনজীবী হিসেবে যাদের নাম দেখছি— তাতে সংশ্লিষ্ট যে কারও মনে হবে বিচারের নামে বুঝি কোনও প্রহসন হতে যাচ্ছে। আমরা বার বার বলছি তদন্ত কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের দক্ষতা, সততা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করছে এই মামলার সাফল্য। এ ক্ষেত্রে কোনও রকম গোঁজামিল, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বা অহেতুক কালক্ষেপণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রহসনে পরিণত করবে।

১৭ মার্চ ২০০১

খালেদা জিয়ার পথের কাঁটা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসন্ন ভারত সফর সম্পর্কে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, 'যদি কিছু আনতে না পারেন তাহলে .... আপনার রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দেব।' ১ জানুয়ারি জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সম্মেলনে এ কথা বলেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। পরদিন এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'বিএনপি দেশের মানুষের অগ্রযাত্রার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছিল। এখন সেই কাঁটাই পরিষ্কার করছি।'

প্রতিপক্ষের পথ কণ্টকিত করা বিএনপির রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা দলটির জন্মকাল থেকে আমরা লক্ষ্য করছি। ১৯৭৫-এ স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতায় এসে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্যান্টনমেন্টে বসেই বিএনপি গঠন করেছিলেন। মেজর জেনারেলের উর্দি পরেই জিয়া বেয়নেটের খোঁচায় '৭২-এর সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় চেতনা মুছে ফেলেছেন, যা অর্জিত হয়েছিল তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা লাঞ্ছিতকরণের কর্মসূচির অংশ হিসেবে '৭২-এর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানকে পাকিস্তানপ্রেমী জেনারেল জিয়া পাকিস্তানের আদলে একটি কদর্য সাম্প্রদায়িক সংবিধানে রূপান্তরিত করেছেন উপরে 'বিসমিল্লাহ...' এবং ভেতরে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' সংযোজন করে। এর পাশাপাশি দালাল আইন বাতিল করে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করে, তাদের দলগঠনের সুযোগ দিয়ে, '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালাল ও ঘাতকদের মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীও বানিয়েছিলেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার যাত্রাপথে কাঁটা বিছিয়ে জিয়া সুস্থ রাজনীতির পথেও কাঁটা বিছিয়েছেন— 'মানি ইজ নো প্রব্লেম', 'আই উইল মেক পলিটিক্স ফর দি পলিটিশিয়ান' ইত্যাদি ঘোষণা করে। ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে জিয়ার এই অবস্থানই প্রমাণ করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তার অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। '৭১-এ খন্দকার মোশতাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুবুল আলম চাষী সহ পাকি-মার্কিনপ্রেমী অনেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, যা তারা চরিতার্থ করেছেন '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু সহ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করে। নিজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য জিয়া সশস্ত্র বাহিনীর দুই হাজারেরও বেশি মুক্তিযোদ্ধাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে ও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছেন, যাঁদের তালিকায় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অধিনায়ক কর্ণেল তাহেরের মতো যুদ্ধাহত অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শত্রু পাকিস্তানকে পরম মিত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান মিত্র ভারতকে চরম শত্রু হিসেবে গণ্য করার রাজনীতি বিএনপি আরম্ভ করেছে জেনারেল জিয়ার জমানা থেকেই। পাঠ্যপুস্তক ও সরকারি প্রচার মাধ্যম থেকে জিয়ার আমলেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের নৃশংস গণহত্যা, নির্যাতন ও যুদ্ধাপরাধের ইতিহাস মুছে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজের 'পাকিস্তানিকরণ' এবং মওলানা মওদুদীর দর্শন অনুযায়ী 'ইসলামিকরণ'ও আরম্ভ হয়েছে '৭৫ থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় জেনারেল জিয়ার যোগ্য সহধর্মিণী খালেদা জিয়া প্রথমবার '৯১ সালে ক্ষমতায় এসেছেন '৭১-এর ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতের সহযোগিতায় এবং দ্বিতীয়বার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসেছেন জামায়াতের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক জোট করে। যুদ্ধাপরাধী ও জঙ্গী মৌলবাদীদের গডফাদার নিজামী-আমিনীদের সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় এসে খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতির অগ্রযাত্রার পথে ইচ্ছেমতো কাঁটা বিছিয়েছেন।

গত এক বছরে গ্রেফতারকৃত জঙ্গী মৌলবাদী নেতারা অকপটে প্রকাশ করেছে পাকিস্তানের 'আইএসআই'-এর অর্থ সাহায্যে তারা কীভাবে বাংলাদেশের জঙ্গীদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, কীভাবে রাজনৈতিক দলের জনসভা, আদালত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ পীর আউলিয়াদের মাজারে গ্রেণেড-বোমা হামলা করেছে এবং কীভাবে বিএনপি ও জামায়াতের শীর্ষ নেতারা তাদের মদদ দিয়েছেন।

খালেদা-নিজামীদের জমানায় যাবতীয় গ্রেণেড-বোমা হামলা ও হত্যার দায় জঙ্গী মৌলবাদীরা কবুল করলেও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং তার পরীক্ষিত মিত্র জামায়াতপ্রধান নিজামীসহ জোটের শীর্ষ নেতারা তখন বলেছেন এসব গ্রেণেড ও বোমা হামলা করেছে আওয়ামী লীগ ও ভারত। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে হরকতুল জেহাদের জঙ্গীরা ময়মনসিংহের তিনটি সিনেমা হলে বোমা হামলা করে বহু মানুষকে হত্যা করেছে। এর কয়েক ঘণ্টার ভেতরই গ্রেফতার করা হয়েছে আমাকে, আমার বন্ধু অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে। মামুন ও আমাকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে— 'বোমা হামলা আওয়ামী লীগ ও ভারত করেছে' এটা লিখে দেয়ার জন্য। আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ উচ্চতর আদালতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রমাণিত হলেও এ নিয়ে খালেদা-নিজামীরা বিন্দুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করেননি। 'হরকতুল জিহাদ', 'জামাতুল মুজাহিদীন' কিংবা 'লশকরে তৈয়বা'র মতো জঙ্গী সংগঠন যতই বলুক তারা পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই'-এর নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যাবতীয় গ্রেণেড-বোমা হামলা করেছে খালেদা-নিজামীদের এক রা— এসব নাকি ভারতের কাজ। তাদের কথা শুনে মনে হয় ভারতের নির্দেশেই পাকিস্তানের আইএসআই বাংলাদেশে তাদের এজেন্টদের দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাচ্ছে!

ভারত থেকে খালি হাতে ফিরলে শেখ হাসিনার পথ কণ্টকাকীর্ণ করার ঘোষণা দিয়েছেন খালেদা জিয়া। এ কাজ তো তিনি এবং তাঁর প্রধান দোসর নিজামীরা করছেন গত এক বছর ধরে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার যখনই

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জঙ্গী মৌলবাদ নির্মূল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে তখন থেকেই খালেদা-নিজামীরা সরকারের চলার পথে কাঁটা বিছানো আরম্ভ করেছে। প্রথমে খালেদা-নিজামীরা বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নাকি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, আবার কখনও বলছেন এই বিচার নাকি ইসলামবিরোধী।

নিজামীদের মতো খালেদা জিয়াও মনে মনে করেন পাকিস্তান ও জামায়াতের সমালোচনা মানে ইসলামবিরোধিতা এবং এ কারণে শেখ হাসিনা ইসলামের দুষমন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হলে খালেদা জিয়া সহ তাঁর অনেক সাঙ্গপাঙ্গ ফেঁসে যেতে পারেন। নিজামীদের যদি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ট্রাইবুনালে দাঁড় করানো হয় তারা নিশ্চয় একা ফাঁসিতে ঝুলতে চাইবেন না। '৭১-এ খালেদা জিয়া কেন ভারতে না গিয়ে ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি জেনারেলদের আতিথেয়তা উপভোগ করেছেন এটা জামায়াতই বলবে। কারণ জামায়াতের মতো খালেদা জিয়াও '৭১-এ পাকিস্তানকে পরম মিত্র এবং ভারতকে পাকিস্তান ও ইসলামের চরম শত্রু মনে করে রণাঙ্গনে জিয়াউর রহমানের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে পাকিস্তানি জেনারেলদের আপ্যায়ন গ্রহণ করেছেন আনন্দের সঙ্গে। তখন থেকে তিনি পাকিস্তানকে ফুল আর ভারতকে কাঁটা মনে করেন। এ হেন খালেদা জিয়া ভারতকে এখনও চরম শত্রু মনে করবেন এটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের দুর্নীতির মামলা ধামাচাপা দেয়ার জন্য খালেদা জিয়া গত এক বছরে কম তেলেসমাতি দেখাননি। বিডিআর বিদ্রোহ দমনের জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন বিদ্রোহ চলাকালে বিডিআর সদর দফতরে গিয়ে নিহত হননি, কেন বিদ্রোহ দমনের নামে প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধতে দেননি এ নিয়ে খালেদার ক্ষোভের অন্ত নেই। তদন্তে কেন এল না— ভারত এ বিদ্রোহের জন্য দায়ী এ নিয়েও তাঁর আক্ষেপ কম নয়। বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ইস্যু নিয়ে হালে পানি না পেয়ে কখনও টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে, কখনও এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযুক্তি, কখনও ট্রানজিট এবং কখনও ভারতীয় দূতাবাসে ভারতের নিজস্ব নিরাপত্তার প্রতিবাদ করে বিএনপি ক্রমাগত আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে এবং যথারীতি জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে।

খালেদা জিয়া নিশ্চয়ই শেখ হাসিনার পথে কাঁটার বদলে ফুল বিছিয়ে দেবেন যদি তিনি দিল্লী থেকে ফিরে এসে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি ও কনফেডারেশনের চুক্তি করেন। জামায়াতের প্রধান নিজামী গত ফেব্রুয়ারি মাসেই বলেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করলে জামায়াত শেখ হাসিনার সরকারকে সহযোগিতা করবে। খালেদাও করবেন যদি তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দায়ের করা সব মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এখন শেখ হাসিনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে— তিনি খালেদা জিয়ার ফুল বিছানো পথে না কাঁটা বিছানো পথে হাঁটবেন।

৩ জানুয়ারি ২০১০

পরিশিষ্ট-১

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেসনোট

দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত কয়েক শ্রেণীর প্রতি বঙ্গবন্ধু সরকারের অনুকম্পা

১৭ মে ১৯৭৩

গতকাল ১৬ মে— বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশ কয়েক শ্রেণীর অভিযুক্ত এবং সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তি ও কয়েক শ্রেণীর অপরাধের ক্ষেত্রে এই ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ১৮ ধরনের এক বা একাধিক বা সকল অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শিত হবে না উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দখলদার সেনাবাহিনীর সপক্ষে দেশের ভিতরে বা বাহিরে প্রচারণায় অংশগ্রহণ, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকার বা সরকারের মন্ত্রীর উপদেষ্টা পদ গ্রহণের জন্য দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত এবং আল বদর বা আল শামস্ এর সদস্য ও রাজাকার কমান্ডার হওয়ার কারণে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও অনুকম্পা প্রদর্শনের আওতায় পড়িবে না সরকারি বিবৃতিতে বলা হয় সরকার ঘোষিত অনুকম্পা লাভে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তিকেই জেল হাজতে থাকিলে এই ঘোষণা প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের লিস্ট হাজির করিতে হইবে। অনুকম্পা লাভে ইচ্ছুক সকলকেই সংশ্লিষ্ট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত মুচলেকা দিতে হইবে এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকারের ঘোষণা দিতে হইবে। বঙ্গবন্ধু সরকার গতকালই প্রথম দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনুকম্পা প্রদর্শনের বিষয় কিছুদিন যাবত সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল। সমগ্র বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনার পর সরকার নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রকাশ করেন।

১। চতুর্থ প্যারায় উল্লেখিত ব্যক্তি এবং অপরাধ সমূহ ব্যতিরেকে পূর্বে উল্লেখিত আদেশ (দালাল আদেশ) বলে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাজা মওকুফ করা হইবে এবং জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি তাহাদের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ ছাড়া অন্য কোন আইন অনুযায়ী অভিযোগ না থাকে এবং তাহাদের যদি সদাচারণের ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করেন এবং লিখিতভাবে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করেন।

২। চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তি ও অপরাধসমূহ ব্যতিরেকে উল্লেখিত আদেশ অনুযায়ী বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষ আদালতের বিচারাধীন সকল ব্যক্তির মামলা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বা আদালতের অনুমোদনক্রমে প্রত্যাহার করা হইবে। অবশ্য যদি তাহারা দালাল আদেশ ছাড়া অন্য কোন বিচারযোগ্য এবং শাস্তিযোগ্য আইনে বিচারাধীন না থাকেন এবং যদি তাহারা সদাচরণের ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করেন এবং লিখিতভাবে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও বাধ্যতা স্বীকার করেন

৩। চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তি ও অপরাধসমূহ ব্যতিরেকে উক্ত আদেশ বলে দায়েরকৃত সকল মামলা তদন্ত এবং অনুসন্ধানমূলক কাজ প্রত্যাহার করা হইবে এবং সকল

গ্রেফতারী পরওয়ানা, হাজীর হওয়ার নির্দেশ ও সম্পত্তি দখলের আদেশ বাতিল করা হইবে এবং এই কারণে ইতিমধ্যে কেহ হাজতে থাকিলে তাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। অবশ্য অন্য কোন শাস্তিযোগ্য বা বিচারযোগ্য আইনে যদি কোন অভিযোগ না থাকে এবং যদি তাহারা সদাচরণের মুচলেকা প্রদান করেন ও লিখিতভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে।

৪ ১, ২ ও ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনুকম্পা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রতি এবং নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না

ক) যাহার উল্লেখিত আদেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের একাধিক সব কয়টি অপরাধের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত কিংবা এই সব অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া কথিত ঃ

১) ১২১- (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা যুদ্ধে প্রচেষ্টা)
২) ১২১- বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র
৩) ১২৪- (ক) রাষ্ট্রদ্রোহিতা
৪) ৩০২- (হত্যা)
৫) ৩০৪- অপরাধযোগ্য নরহত্যা
৬) ৩৬৩- (অপহরণ)
৭) ৩৬৪- (হত্যার জন্য অপহরণ)
৮) ৩৬৫- (আটক রাখার জন্য অপহরণ)
৯) ৩৬৮- অপহৃত ব্যক্তিদের গোপন করা এবং আটক রাখা)
১০) ৩৯৬- ধর্ষণ
১১) ৩৯২- চুরি
১২) ৩৯৪- জখম করিয়া চুরি
১৩) ৩৯৬- ডাকাতি
১৪) ৩৯৬- খুন করিয়া ডাকাতি
১৫) ৩৯৭- খুন বা গুরুতররূপে আহত করার চেষ্টা করিয়া চুরি বা ডাকাতি।
১৬) ৪৩৫- আগুন বা বিস্ফোরক উপাদানের সাহায্যে দুষ্কৃতি।
১৭) ৪৩৬- ঘর নষ্ট করার মতলবে আগুন বা বিস্ফোরক উপাদানের সাহায্যে দুষ্কৃতি।
১৮) ৪৩৮- আগুন বা বিস্ফোরকের সাহায্যে নৌযানে দুষ্কৃতি।

খ) দখলী আমলে উপ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত অথবা অভিযুক্ত অথবা নন্দিত।

গ) দখলদার বাহিনীর অনুকূলে স্বদেশী বা বিদেশে প্রচারণা চালাইয়া বা এই ধরনের প্রচার চালাইবার জন্য কোন পাকিস্তানি প্রতিনিধি দল বা কমিটির সদস্যরূপে বিদেশে গমন করিয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।

ঘ) দখলি আমলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বা পাকিস্তান সরকারের গভর্নর মন্ত্রী বা উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত, অভিযুক্ত বা কথিত।

ঙ) আল বদর বা আল শামস্ সংগঠনের সদস্য হইয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বলিয়া কথিত

চ) রাজাকার কমান্ডার হইয়া দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত ;

ছ) দখলি আমলে জেলা, মহকুমা বা থানা শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান, আহ্বায়ক বা সেক্রেটারী হইয়া দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত অভিযুক্ত বা কথিত

জ) দখলি আমলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় শান্তি কমিটির কর্মকর্তা হইয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত ;

ঝ) মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ও সংগঠনে দমন বা পার্থিব সুবিধা আদায়ের মানসে দখলদার বাহিনীকে তথ্যাদি সরবরাহ এবং সাহায্যদানের মাধ্যমে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত ।

৫ এই ঘোষণার আওতায় অনুকম্পা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ যাহারা জেলে হাজতে আছে অথবা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে যাহাদের হাজির করা হইবে বা হাজির হওয়ার জন্য যাহাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা বা হুলিয়া জারি হইয়াছে এবং যাহারা পালাইয়া বেড়াইতেছে, ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার জন্য এই ঘোষণা প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইতেছে ।

৬ । প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার ঘোষণার পর অনুরূপ মুচলেকা প্রদানকারী ও ঘোষণাকারী ব্যক্তিবর্গকে যাহারা যদি দণ্ডপ্রাপ্ত হয় তবে ৪০১ নং ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনিত দণ্ডাদেশ মওকুফের যথাযথ নির্দেশ অনুযায়ী জেল হইতে খালাস করা হইবে। অথবা তাহারা যদি বিচারাধীন থাকে তবে ৪৯৪ ফৌজদারী কার্যবিধির আওতাধিন বিশেষ ট্রাইবুন্যাল অথবা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়া মামলা প্রত্যাহারের পর হাজত হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে । অবশ্য মুক্তির শর্ত হইতেছে যে, তাহাদের যদি উপরোক্ত আদেশের বাহিরে বিচারযোগ্য ও শাস্তিযোগ্য অন্য কোন অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে এবং গ্রেফতারের জন্য জারিকৃত সকল পরোয়ানা ও হাজির হওয়ার জন্য সকল ঘোষণা এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ বাতিল করা হইবে এবং ফিরাইয়া নেওয়া হইবে

পরিশিষ্ট-২

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মহজোট সরকারের ৭ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল সহায়ক মঞ্চ' এবং 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র চিঠি

ঢাকা, ৭ জুলাই ২০১০

মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী, মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও মাননীয় পূর্তপ্রতিমন্ত্রী সমীপে,

বিষয় ঃ '৭১-এর গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য গঠিত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল'-এর কার্যক্রম অর্থবহ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ

সবিনয় নিবেদন,

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল'-এর কার্যক্রম অর্থবহ ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আমরা গত ২৬ জুন ২০১০ তারিখে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল ঢাকা সহায়ক মঞ্চ' গঠন করেছি। এই মঞ্চের সঙ্গে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের ৭১ জন আইনজ্ঞ ও মানবাধিকার নেতা যুক্ত রয়েছেন

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি একশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিভিন্ন কারণে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল' পুর্ণোদ্যমে কার্যক্রম আরম্ভ করতে পারেনি, যা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রত্যাশী সমগ্র জাতিকে হতাশ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে তাঁর অঙ্গীকারের কথা বহুবার ব্যক্ত করার পরও তদন্তের ক্ষেত্রে মন্থরতা এবং ট্রাইবুনালের অপূর্ণতার কারণে আমাদেরকে উদ্যোগী হতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে—

১) ট্রাইবুনালের জন্য এ পর্যন্ত ৭ জন আইনজীবী ও ৭ জন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আমরা মনে করি তদন্ত ও বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার জন্য অন্ততপক্ষে ২৫ জন আইনজীবী ও ২৫ জন তদন্ত কর্মকর্তা অবিলম্বে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন; যাদের দক্ষতা, সততা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি অঙ্গীকার হবে প্রশ্নাতীত।

২) যে স্বল্প সংখ্যক আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তা এ পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করার মতো পর্যাপ্ত স্থান পুরনো হাইকোর্ট ভবনে সঙ্কুলান করা হয়নি পৃথক স্থানে তাদের দফতর স্থানান্তর ট্রাইবুনালের কার্যক্রমের গতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে।

৩) এখন পর্যন্ত ট্রাইবুনালের ভবনের একটি বড় অংশ জুড়ে আইন কমিশনের দফতর রয়েছে যা এই ভবন থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য নাগরিকদের ফোরাম থেকে
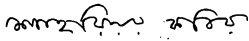
একাধিকবার বলা হয়েছে। ট্রাইবুনালের স্থান সঙ্কুলান এবং নিরাপত্তার জন্য আইন কমিশনের দফতর অবিলম্বে পুরনো হাইকোর্ট ভবন থেকে সরিয়ে অন্যত্র নেয়ার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট দাবি জানাচ্ছি।

৪) ট্রাইবুনালের কার্যক্রমের সঙ্গে, বিশেষভাবে অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে একাধিক মন্ত্রণালয় জড়িত রয়েছে আমরা মনে করি ট্রাইবুনালের সামগ্রিক কার্যক্রম গতিশীল করার প্রয়োজনে বরাদ্দকৃত অর্থ ট্রাইবুনালের হিসাবে থাকা উচিৎ, যাতে করে ট্রাইবুনালকে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রণালয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধর্ণা দিতে না হয়।

৫) ট্রাইবুনালের স্থান এবং ট্রাইবুনালের সঙ্গে যুক্ত আইন ও তদন্ত কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং পরিবহনের ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি। ট্রাইবুনালের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। আমরা মনে করি অবিলম্বে ট্রাইবুনালের মূল প্রবেশদ্বার থেকে সম্পূর্ণ ভবন সিসিটিভি ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণে আনা এবং পার্শ্ববর্তী মাজারের প্রবেশপথ ঈদগাহ ময়দানের দক্ষিণ পশ্চিমে সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন যে কোন জঙ্গী আত্মঘাতী/ চোরাগোপ্তা হামলার মোকাবেলা করার মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ট্রাইবুনালে থাকতে হবে।

৬) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের জন্য জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের দেশী/বিদেশী সহযোগীরা দেশে/বিদেশে বহুমাত্রিক তৎপরতা আরম্ভ করেছে। বিদেশে তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে '৭৩-এর 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইনে' যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে যা কূটনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার মতো কোনও উদ্যোগ এখনও দৃশ্যমান নয়। '৭৩-এর আইনের মান ও উপযোগিতা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকাশনা রয়েছে যা সংগ্রহ করে আমাদের দূতাবাসগুলোতে পাঠাতে হবে।

৭) যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনমত সংগঠনের ক্ষেত্রে আমাদের দূতাবাসগুলোকে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিপক্ষ যাতে একতরফা বক্তব্য প্রদানের সুযোগ না পায় সে বিষয়ে দূতাবাসগুলোকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৮) আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী এবং ট্রাইবুনালের কর্মকর্তারা ট্রাইবুনালের বিচার পদ্ধতি, তদন্তের ধরন ও পর্যায় এবং কার কার বিচার কীভাবে করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে সব কথা বলছেন তাতে এরকম মনে হতে পারে যে ট্রাইবুনাল সরকারের অধীন কোন সংস্থা। তদন্তের ধরন ও স্তর সম্পর্কে ট্রাইবুনালের কর্মকর্তারা গণমাধ্যমে যা বলছেন তা সুষ্ঠু তদন্ত ও মামলা পরিচালনার অনুকূল নয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে— ট্রাইবুনালের একজন উপযুক্ত মুখপাত্র বা গণসংযোগ কর্মকর্তা থাকা উচিৎ যিনি বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে দেশী/বিদেশী গণমাধ্যমকে যতটুকু জানানো প্রয়োজন ততটুকু বলবেন। ট্রাইবুনালের কর্মকর্তারা যখন তখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং এক এক পত্রিকায় এক এক ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে এরকম হওয়া উচিৎ নয়।

৯) '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গত তিন বছরে দেশের বিভিন্ন থানায় শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে যার ভেতর জামায়াতের গ্রেফতারকৃত তিন শীর্ষ নেতাও রয়েছেন সম্প্রতি তাদের গ্রেফতারের প... '৭১-এ মুক্তিযোদ্ধা হত্যার জন্য অতীতে বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত মামলা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে আমরা সংবাদপত্র থেকে অবগত হয়েছি। আমরা মনে করি '৭১-এর হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও লুণ্ঠনসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের একমাত্র এখতিয়ার রয়েছে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে'র, অন্য কোন আদালতের নয়। অতীতে দায়েরকৃত এসব মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা করে আমলযোগ্য মামলা ট্রাইবুনালের এখতিয়ারে আনার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা আশা করব যুদ্ধাপরাধীদের বিচারিক কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ আমাদের বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন যাতে বাংলাদেশ যথাসময়ে স্বচ্ছ ও মানসম্পন্ন বিচার নিশ্চিত করে সমগ্র বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।
এ বিষয়ে সরকারকে এবং ট্রাইবুনালকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস আমরা দিচ্ছি
বিনীত
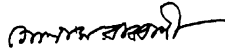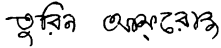
(শাহরিয়ার কবির)
আহ্বায়ক
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল সহায়ক মঞ্চ

(বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী)
সভাপতি
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি
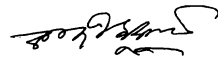
(ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ)
সদস্য সচিব
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল সহায়ক মঞ্চ

(কাজী মুকুল)
সাধারণ সম্পাদক
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি
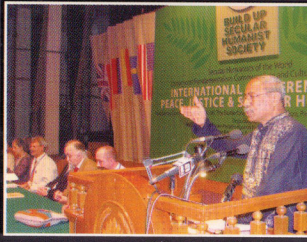
২০ জুন ২০১০, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনে
ভাষণ দিচ্ছেন লেখক শাহরিয়ার কবির

বাংলাদেশে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী মুজিবনগর সরকারের আমল থেকে। বঙ্গবন্ধু তাদের বিচার আরম্ভও করেছিলেন, যা জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বন্ধ করে দেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তাদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' আন্দোলন করছে ১৯৯২ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পেশাজীবী-মুক্তিযোদ্ধা-ছাত্র-যুব-নারী সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে বেগবান করেছে। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোটের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। মহাজোটের অভূতপূর্ব বিজয় ছিল এই বিচারের প্রতি বিপুল সংখ্যক তরুণ নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন।

২০১০ সালের ২৫ মার্চ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য মহাজোট সরকার 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল' গঠন করেছে। এই ট্রাইবুনাল গঠনের আগে থেকেই জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা বিচার বানচাল করার জন্য দেশে ও বিদেশে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে। এসব কাজের জন্য তারা কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ব্যক্তিকে ভাড়াও করেছে। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে '৭৩-এর আইন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর সরকারের সাধারণ ক্ষমা, এত বছর পর বিচারের যৌক্তিকতা, ট্রাইবুনালের কার্যবিধি প্রভৃতি বিষয়েও তারা মিথ্যা ও বিভ্রান্তমূলক প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। তাদের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরকার শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কখনও সরকারের নীতিনির্ধারকরাও বিচারের ধরন ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিভ্রান্তমূলক মন্তব্য করছেন। যার ফলে দেশে ও বিদেশে অনেকে এই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি নস্যাৎ করার জন্য জামায়াতীরা শুরু থেকে '৭১-এর ঘাতক দালালদের বিচারের আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করছে, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক কথা বলছে, দাবি করছে '৭১-এ যুদ্ধাপরাধের কোন ঘটনা ঘটেনি, জামায়াতের ভেতর কোন যুদ্ধাপরাধী নেই, বঙ্গবন্ধু সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ইত্যাদি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এবং এ সম্পর্ক বিভ্রান্তি দূর করার জন্য লেখক শাহরিয়ার কবির গত ১৯ বছর ধরে জামায়াতের মিথ্যাচারের জবাব দিচ্ছেন লেখালেখি ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের দ্বারা। বর্তমান গ্রন্থে ২০১০ সালে এ বিষয়ে লেখকের নির্বাচিত কয়েকটি রচনা সংকলিত হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পদ্ধতি ও '৭৩-এর আইন সম্পর্কে যাবতীয় বিভ্রান্তি নিরসনে এই গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।